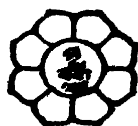
# কার্ল মার্ক্স

( জীবনী ও মতবাদ )

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য



প্রকাশক : পূর্ব্বাশা : কলকাতা ১

পরিবেশক

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫০

প্রকাশক / সত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্ব্বাশা / ৩২ পটলডাঙা স্ট্রীট / কলকাতা ৯

মুদ্রক / প্রদ্যুৎকুমার মান্না
বিশ্বকর্মা প্রেস / ২/১এ আশুতোষ শীল লেন / কলকাতা ৯

এই পুস্তক প্রফেসর্স করেসপণ্ডেন্স কলেজের স্বত্বাধিকারী অনুজ প্রতিম শ্রীমান স্বপন বসুর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

# কার্ল মার্ক্স

পৃথিবীতে বোধ হয় এমন মানুষ একজনই আছেন যাঁর নামের সঙ্গে প্রচুর শ্রদ্ধা আর প্রচুর ঘৃণা সমান ভাবে জড়িয়ে আছে। খ্রীষ্টের জন্মেরও আঠারো শ' বছর পরে—পৃথিবী যখন সভ্য—তখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে বার বার লেখা হয়েছে এই নাম, আবার এই নামেরই বিভীষিকা লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে জাগিয়ে তুলেছে ভয়, ব্যাকুলতা, সন্ত্রাস। খ্রীষ্টের মতো তিনি মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা নিয়ে আসেন নি—তিনি ছিলেন মানুষ—নিতান্ত মর্ত্যেরই মানুষ—যে বঞ্চিতদের রক্তে, মাংসে, পেশীতে মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠে তাদেরই বলিষ্ঠ দাবী ছিল তাঁর কণ্ঠে। প্রত্যেকটি মানুষের যে মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার আছে, সে-কথাই তিনি উচ্চারণ করে গেছেন। আজও মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে চায়—তাই কার্ল মার্ক্সের নাম আজও মুছে যায় নি আর তাই আজও কার্ল মার্ক্সের নাম মুছে ফেলবার জন্যে তাঁরই জন্মভূমিতে ঝটিকা-বাহিনী তৈরী হয়—গর্জে ওঠে ট্যাঙ্ক আর স্টুকা।

আজকের জার্মেণী নয়, একশ' পঁচিশ বছর *আগেকার জার্মেণীকে যদি আমরা স্মরণ করি—প্রুশিয়ার একটি ছোট সহর ট্রেভেস্-কে যদি মনে পড়ে, একজন শিক্ষিত উদার জ্যু আইনজীবীর পরিবার দেখতে পাবো আমরা সে সহরে। ৫ই মে তারিখে সে পরিবারে একটি শিশুর জন্মোৎসব হচ্ছে। জ্যু হলেও নবজাত শিশুর পিতা শাইলক নন—দরিদ্র র‍্যাবি পরিবারের লোক ছিলেন বটে তিনি—তবু ইদানিং সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পেয়েছেন কিন্তু কি করে টাকা রাখতে হয় শিখতে পারেন নি। মা-ও ছিলেন হল্যাণ্ড-প্রবাসী হাঙ্গেরীর একটি র‍্যাবি পরিবারের মেয়ে—কিন্তু স্বামীর মতো টাকা-পয়সা ব্যাপারে হয়ত তিনি ততটা উদাসীন ছিলেন না। অবশ্যি দারিদ্র্য সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল কিন্তু তা বলে একদিন ছেলে সম্বন্ধে একথা না বলে তিনি

* এই বইটি ১৯৪৩-এ লেখা

পারেন নি : "পুঁজি সম্বন্ধে এক গাদা না লিখে কার্ল যদি এক গাদা পুঁজি করতে পারত তা হলে ঢের ভালো ছিল।" মা যে-পুঁজির কথা বলেছিলেন সে-পুঁজি না থাকলেও, অনেকগুলো ভাইবোনের মধ্যে এ-ছেলেটিরই মনের পুঁজি ছিল সবচেয়ে বেশি। হতে পারে কিছুটা এ তার উত্তরাধিকার।

ফরাসী বিপ্লব শেষ হয়ে য়ুরোপে তখন মেত্তারনিকের যুগ চলেছে—মেত্তারনিক প্রাক্-বৈপ্লবিক দিনগুলোকে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করছেন। নিজের বজ্রমুষ্টি আর রক্তচক্ষুকেই তাঁর বিশ্বাস ছিল বেশি—এ ধারণাটা ছিল না যে উৎসের মুখে পাথর চাপা দিয়ে জলকে বাইরে আসতে না দিলেও, জল মাটির নীচে থেকে সমস্ত মাটিকে ভিজিয়ে তোলে। য়ুরোপের মাটিতে তখন ঢুকে পড়েছে যন্ত্রসভ্যতার বিপ্লবী বীজ—হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে রুশো ভল্টেয়ারের বাণী। জমিদারের আভিজাত্যকে সরিয়ে দিয়ে, যন্ত্রসভ্যতার পেছনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুর শোনা যাচ্ছে। রাজসরকারের লোক হয়েও তাই মার্ক্সের বাবা ছিলেন ভল্টেয়ারে আসক্ত—জ্যু-র গোড়ামি বর্জন করে দেখা গেল, তিনি লুথারের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জ্যুর কোন সঙ্কীর্ণতাই তাঁর ছিল না—সে-যুগের খাঁটি মধ্যবিত্ত জার্মাণের মত স্বাদেশিকতাও ছিল তাঁর প্রবল—তাই একবার মার্ক্সকে তিনি বলেওছিলেন : "নেপোলিয়ঁার পতন আর প্রুশিয়ার বিজয়-গৌরব নিয়ে একটি গাঁথা রচনা করতে পারো ?"

বাপের দিকে তাকালে তাই মার্ক্স বর্তমানকেই দেখতে পেতো—পচে যাওয়া অতীতকে নয়। বালক মার্ক্সের মন তৈরী হয়েছিল বর্তমানের উপাদানে—হয়ত তাই সে-মন যাত্রা করেছিল ভবিষ্যতের দিকে, কোনো সময় অতীতে আবদ্ধ হয়ে মনের সচলতাকে পঙ্গু করবার দুর্যোগ তার আসেনি।

শুধু বাপই নন—বাপের চেয়েও সংস্কৃতিবান একটি মনের স্পর্শ বালক মার্ক্স লাভ করেছে স্কুলে পড়বার সময়। বাপের বয়েসী হলেও

তিনি তার বন্ধুই ছিলেন—গভর্ণমেণ্টের প্রিভি কাউন্সিলারের আভিজাত্য নিয়েও ফন্ ওয়েষ্টফালেন অল্পবয়েসীদের সঙ্গে আলাপ করতে ভালোবাসতেন। প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ ছিল তাঁর প্রচুর—আর সত্যকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের মতই ছিল তাঁর বিচার বুদ্ধি। সেক্সপীয়ার আর হোমার ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। তাঁর কাছ থেকে মার্ক্স তাই যে কেবল সত্যানুরাগই পেয়েছিল তা নয়—কবিতার প্রতি অনুরাগের হাতেখড়িও তার এখানেই।

পড়াশুনোয় ভালো ছেলে মার্ক্স খুব ভালো পাশ করে বেরুল গ্রামার স্কুল থেকে। এমন ছেলেকে পড়ানোই উচিত—তাকে পাঠান হল 'বন'-বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাপের ইচ্ছা, ছেলে আইন পড়ুক।

কিন্তু বাপের ইচ্ছায় যেমন মার্ক্স জার্মেণীর বিজয়-গাঁথা লেখেনি—তেমনি তার আইন পড়াও হয়ে উঠল না। জ্ঞানের পিপাসা যার মগজে ঢুকে গেছে আইন-শাস্ত্রের একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। তবু একটা বছর কেটে গেল তার 'বন্' বিশ্ববিদ্যালয়েরই আবহাওয়ায়—ছাত্রজীবনের আনন্দ-কোলাহলে। মনে তারুণ্যের জোয়ারকে মার্ক্স তখনো পুঁথির চাপে রোধ করতে চায় নি। তাই দেহের রূপ আর মনের সংস্কৃতি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল যে-তরুণী তাকে সে জীবনের বাইরে সরিয়ে রাখতে পারল না। সে-তরুণী তার পিতৃতুল্য বন্ধু ফন্ ওয়েষ্টফালেনের মেয়ে জেনি। একটি ভালো ছেলে একটি ভালো মেয়েকে ভালোবাসতে সুরু করল—কিন্তু তা গোপনে। ছুটির দিনে নিজের ছোট সহরে হয়ত ফিরে আসে আঠারো বছরের একটি ছেলে—হয়ত সেদিনই সহরের নামজাদা বাড়ির মস্ত ফটক পার হয়ে ছেলেটি হাঁটতে থাকে বাগানের রাস্তা ধরে—চোখ তার যেন কি খুঁজছে, আর মনে জমে আছে কত কথা বড় সহরের ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও যে সে ভুলতে পারে নি একটি মেয়ের সোণালি চোখ আর চুল—ভুলতে পারে নি গলার স্বর, সে-কথাই বলতে এসেছে বুঝি আজ। বারান্দার ওদিক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল মেয়েটি—সে কি তারই

অপেক্ষায় ছিল? শুনতে পেয়েছে কি পায়ের শব্দ? দৌড়ে ছেলেটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি—নরম পাৎলা ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি নিয়ে। ছেলেটির বলিষ্ঠ মুখে বলিষ্ঠ হাসি। বয়সে চার বছরের ছোট ছেলেটির দিকে চেয়ে মেয়েটি ভাবছিল—তাদের মনের, অনুভূতির আর শিক্ষার বয়েস বুঝি এক। ১৮৩৬ এ কার্ল হাইনরিশ্ মার্ক্স আর জেনি ফন্ ওয়েষ্টফালেনকে নিয়ে আমাদের কল্পনা এমন একটি ছবিই ফুটিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এ নিয়ে সত্যিকারের কার্ল মার্ক্স তৈরী নন। তাঁকে তৈরী করবার অপেক্ষায় ছিল সেদিনকার বার্লিন সহর। হেগেলের ভাষায় সেদিনকার বার্লিন ছিল 'সংস্কৃতি ও সত্যের কেন্দ্র'। সত্যের সন্ধানে মার্ক্সের মন ছিল ব্যাকুল—বার্লিনের ইসারায় তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল জানবার মতো, বুঝবার মতো অফুরন্ত ভাণ্ডার পড়ে আছে বার্লিনে। রাক্ষসের ক্ষুধা নিয়ে মার্ক্স পড়তে সুরু করলেন—দর্শন, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব। তাঁর তখনকার লেখা একটি কবিতায় নিজের মনের অবস্থাটা সুন্দর করে আঁকা আছে: "আমার মনে সাড়া তুলছে যারা, তারা ত নীরব থাকতে চায় না, সামনের দিকে তারা ছুটে যেতে চায় অশান্ত অবারিত ডানায় ভর করে। স্বর্গের সুষমাকে আমি জীবনের অংশ করে তুলব, প্রবেশ করব বিজ্ঞানের অন্তরে, শিল্পসঙ্গীতের আনন্দকে দুহাতে জড়িয়ে ধরব।"

মনের এই অদ্ভুত সমৃদ্ধি নিয়ে মার্ক্স যে এ সময়ে তিনটি কবিতার বই লিখে ফেলবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবু কেবল কবিতার ভাষাতেই সে-মন তৃপ্তি পেয়ে দেউলে হয়ে যায় নি। তখন থেকেই জীবনকে সত্যি করে বুঝতে চেয়েছেন মার্ক্স—জীবনের বাইরের খোলসটা নয়, তার মূলকে সন্ধান করবার আগ্রহ ছিল তাঁর। তাই দর্শনের চাপে কবিতাগুলো হ'ত তাঁর ভারি—তাতে কাব্যের সহজ

সরল অবাধ গতি যতটা না ছিল ততটা ছিল দার্শনিক চিন্তার গুরুগম্ভীর পদক্ষেপ। তবু কবিতা লেখাই ছিল তাঁর তখন সবচেয়ে বড় কাজ—তার পরেকার কাজ ছিল আইনশাস্ত্র পড়া, আর তা শুধু পিতার ইচ্ছা-পূরণ করবার খাতিরে। কিন্তু আইনশাস্ত্রও তিনি ডিগ্রী লাভের আশায় পড়েন নি—তা থেকে খুঁটে খুঁটে সব সময়ই দর্শনের সূত্র বার করবার চেষ্টা করেছেন। বার্লিনে যাবার এক বছরের মধ্যেই 'আইনের-দর্শন' সম্বন্ধে তিনি তিন শ তা' কাগজ লিখে ফেললেন। খাস্ দর্শনকে নিয়েও তার আদর্শবাদী মনের এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। এ সময়কার একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মানসিক জীবনের প্রত্যক্ষ বিকাশ দেখতে পাই আমরা আইনে, রাষ্ট্রে, প্রকৃতিতে এবং সমস্ত দার্শনিক চিন্তার অঙ্গে—এই মানসিক জীবনের উন্নতির জন্যেই আমাদের সব পড়াশুনো।" জার্মেণীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হেগেলের লেখার সঙ্গে তখনই তাঁর পরিচয় হতে সুরু করে। কিন্তু হেগেলের পরিপূর্ণ স্বাদ তিনি তখন গ্রহণ করতে পারেন নি—মনে তাই ছিল তাঁর সংশয়ের আর দ্বিধার দুর্ভেদ্য কুয়াশা।

বার্লিনের এক ডাক্তারের কামরায় হয়ত তখন দেখা যেতো একটি ছাত্রকে। উস্কোখুস্কো চুল, বহুরাত্রির অনিদ্রায় চোখ লাল—ক্লান্ত শরীরটা টেনে এনে ছাত্রটি দাঁড়িয়েছেন ডাক্তারের সামনে।

"পাড়া গাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিন—" বিধান দিচ্ছেন ডাক্তার।

সহর ছেড়ে যাবার সময় সে-ই প্রথম সহরটাকে দেখতে পাবার সুযোগ হল ছাত্রটির—বই-এর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি বাইরের আলো-বাতাসে। সহরে থাকলে পড়ার হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। চিন্তার একটা ধারা গড়ে তোলেন আজ—কালই আবার বিপরীত চিন্তায় তাকে মুছে ফেলতে হয়। যে দার্শনিক মতবাদকে তিনি ঘৃণা করেন তা-ই তাঁর মনে এসে বারবার উঁকি দিতে থাকে। এই হতাশার উপর এলো তাঁর ভাবী স্ত্রীর অসুখের খবর। শরীরকে আর সুস্থ রাখা চলল না। শয্যাশ্রয়ী হয়ে থাকতে হলে তবু মনের অবসর মেলে

প্রচুর। রোগশয্যায় আদ্যোপান্ত হেগেলকে তিনি পড়ে নিলেন।

সুস্থ হয়ে উঠে মার্ক্স তাঁর লেখা সমস্ত কবিতা আর ছোট গল্প লিখবার উপাদানগুলো পুড়িয়ে ফেললেন। হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল —এ-কাজ আর নয়।

বার্লিন থেকে ষ্ট্যালাও-এ এসে তাঁর স্বাস্থ্যের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল। মনের দিক থেকেও তিনি উপোসী রইলেন না। সেখানকার 'গ্র্যাজুয়েটস্ ক্লাবে' কয়েকটি শিক্ষিত মনের স্পর্শে—নানা মতবাদের আলোচনায়, তাঁর মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল দিনের পর দিন। কিন্তু যে মতবাদকে তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন ক্রমে তাতেই জড়িয়ে পড়লেন শেষে।

হেগেলের সঙ্গে মার্ক্সের ঘনিষ্ঠতার সূচনা এই।

এই দার্শনিক ছেলেকে নিয়ে তাঁর বাবা কিন্তু মোটেও খুসী হতে পারেন নি। এই সব শুকনো কঠিন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শরীর-মন নষ্ট করে কি লাভ—অথচ সঙ্গী ছেলেরা পাঠ্য বই পড়ে দিব্যি ভবিষ্যৎ তৈরী করে নিচ্ছে। বৈষয়িক বাবা দার্শনিক ছেলে নিয়ে কি করবেন?

নিজের পথ ছেড়ে বাবাকে খুসী করতে পারলেন না কার্ল মার্ক্স। যাঁরা ধর্মবিশ্বাসের বিনিময়ে জগতের একটা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সন্ধান পান, তাঁদের কাছে পিতৃআজ্ঞা খুব বড় জিনিষ নয়, একটা সরকারী চাকরিও তাঁদের কাছে খুব লোভনীয় নয়। ছেলের বিদ্যানুরাগের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেই শেষটায় বাবা চুপ করে গেলেন —কিন্তু ছেলের সাফল্য দেখবার সৌভাগ্য তাঁর আর হয়নি।

বাবার মৃত্যুর পর মার্ক্স অনন্যমনে তাঁর দার্শনিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টায় লেগে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হতে লাগলেন ডিগ্রী পরীক্ষা দেবার জন্যে। 'গ্র্যাজুয়েটস্ ক্লাবে' পরিচিত ব্রুনো বাওয়ার মার্ক্সকে ভরসা দিলেন, 'বন্'-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের কাজ

নিয়ে দেবেন। ১৮৪১-এ এপিকিউরাস এবং ডেমোক্রিটাস-এর দর্শনের উপর একটি থিসিস লিখে মার্ক্স 'ডক্টর' উপাধি লাভ করলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়াশুনো এখানেই তাঁর শেষ।

অধ্যাপকের কাজের জন্যে 'বন্‌-এ এসে বাওয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন মার্ক্স। বাওয়ার নিজেও একটা চাকরির উমেদার ছিলেন। কিন্তু প্রুশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন-চিন্তা যাঁরা করেন তাঁদের কোনো রকম প্রশ্রয় ছিল না। বাওয়ার নিজেরই কোনো সুবিধা করতে পারলেন না—মার্ক্সকে কিছু করে দেওয়া ত দূরের কথা। কারণ নিজের স্পষ্ট, স্বাধীন মতকে চেপে রাখবার ছেলেই মার্ক্স ছিলেন না।

জীবিকা-অর্জনের সহজ সরল পথ বন্ধ হয়ে গেল মার্ক্সের—কিন্তু সত্য উপলব্ধি যাঁর আছে, তাঁর সাহসও থাকে অসীম, জীবনকে নিয়ে ভয় পাবার তাঁর কিছু নেই। সাংবাদিকদের কাজ করবার একটা সুযোগ উপস্থিত হল তাঁর—সেই সুযোগকেই তিনি আঁকড়ে ধরলেন। তখন জার্মেণীর মানসিক সংস্কৃতি নির্ভর করছিল 'তরুণ হেগেলীয় দল'-এর উপর। ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ হেগেল দিয়েছিলেন এই দল প্রচুর উৎসাহে তা-ই গ্রহণ করেছিল। তারাও হেগেলের মতই ভেবে নিয়েছিল যে কোনো এক স্বৈরাচারী-শাসিত শাসনতন্ত্রের যুগ থেকে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কাজের যুগ পর্যন্ত যে-বিবর্তন দেখা যায় ইতিহাস তারই স্বাক্ষর বহন করে। মার্ক্সও এই তরুণ হেগেলের দলের মনোভাবে ও মতবাদে আসক্ত ছিলেন। রাষ্ট্র বিবর্তনের এই ধারণা নিয়ে এবং হেগেলীয় দর্শনের সূত্রগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করে তিনি তখনকার মত একজন উদারপন্থী হয়ে উঠলেন। আর ঠিক সেই সময়েই রাইন প্রদেশের উদারপন্থীরা 'রাইনিশ্‌ ৎসাইটুং' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেন। তার সম্পাদক হলেন ডক্টর রুটেনবের্গ, মার্ক্সের একজন প্রাক্তন বন্ধু। নানা বিষয়ে মার্ক্স সে কাগজে প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলেন—আর সে সব প্রবন্ধের খ্যাতি ও খাতিরও হতে লাগল খুব। তাই ১৮৪২-এ যখন রুটেনবের্গ 'রাইনিশ্‌

ৎসাইটুং'-এর সম্পাদনা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, কর্তৃপক্ষ কাগজটির সম্পাদনার ভার তুলে দিলেন মার্ক্সেরই হাতে।

সম্পাদক হয়ে মার্ক্সকে একটি নূতন বিষয়ের দিকে চোখ ফেরাতে হ'ল—দেশের অর্থ নৈতিক সমস্তার অনেক বর্ণনাই তাঁর কাগজে ছাপা হত—তাই তার সমাধানের সূত্র খোঁজবার জন্যে অর্থনীতির চর্চা করতে তিনি বাধ্য হলেন। তাছাড়া তাঁরই কাগজে মাঝে মাঝে ফরাসী সমাজতন্ত্রের সুর বেজে উঠত, অথচ এ সম্বন্ধে তাঁর পড়াশুনো প্রায় কিছুই ছিল না—তাই সে সব আলোচনায় যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। সম্পাদনার কাজ করে একটি নূতন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। তার জন্যে অবসর চাই। আর সে-অবসর তাঁর একটা সুযোগে হঠাৎ জুটেও গেল। পুলিশের ভয়ে কর্তৃপক্ষ পত্রিকার সুরটা নামিয়ে আনলেন—মার্ক্সও সম্পাদকের কাজে ইস্তফা দিয়ে আবার এসে আশ্রয় নিলেন তাঁর পড়ার ঘরে।

১৮৪১-এ ল্যাড্উইগ্ ফয়ারব্যাক 'Essence of Christianity' বইটি লিখে হেগেলের দলে ভাঙন ধরিয়ে দিলেন—দেখা গেলো নিজে হেগেলীয় হয়েও তিনি হেগেলকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন না। হেগেল যে একটা শাশ্বত মনকে ( পরমাত্মা ) সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন—তার প্রতি ফয়ারব্যাকের শ্রদ্ধা ছিল না—তিনি ঘোষণা করলেন, শাশ্বত মানুষই সত্য। হেগেলীয় দলে বামপন্থার উদ্ভব হল—ফয়ারব্যাক্ তার বীজ বপন করলেন। মার্ক্সও সে দলেই ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সংস্পর্শে এসে ফয়ারব্যাকের দর্শনও মার্ক্সের কাছে মনে হল কুয়াশাচ্ছন্ন—তাতে যেন সত্যের জ্যোতি খুবই ম্লান।

সমাজতন্ত্রের সংক্রমণ পথে মার্ক্সকে দেখা যায় যে তিনি হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তন ও ঐতিহাসিক মনোভাব মাত্র গ্রহণ করেছেন কিন্তু হেগেলের শাশ্বতকে সত্য না বলে মানুষের সমাজকেই বলেছেন সত্য। ফয়ারব্যাকের মতো বিশ্বের কেন্দ্রে মার্ক্স মানুষকেই স্থাপন করলেন—

কিন্তু সে মানুষে ভাববাদের বাষ্পও নেই—সমাজ, কর্মনিষ্ঠ সে মানুষ। ১৮৪৩-এ এই নূতন জ্ঞানের আলো এসে লাগল মার্ক্সের চোখে।

জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মার্ক্স। তা খাওয়া পরার জীবন নয়—বিপ্লবী আদর্শবাদীর জীবন—মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চাওয়া, কোটি কোটি মানুষের জীবনের সত্য কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বার করা যাঁর কাজ—নিজেকে নিয়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র গণ্ডী তৈরী করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারেন না। হেগেলের সাহায্যে জীবন-দর্শনের পথে অনেক দূর এসে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ শোনা গেল নূতন সুর—শোনা গেল ফরাসী সমাজতান্ত্রিক প্রুঁধ মানুষেরই কথা বলছেন—ল্যাডউইগ ফয়ারব্যাক যে-মানুষের কথা বলেছেন তার চেয়েও বিভিন্ন এ কাহিনী—শোনা গেল সে-মানুষ ভাব-রাজ্যে বিচরণ করে না, নেহাৎ পৃথিবীরই হাসিকান্নায় দুঃখে নির্যাতনে, অত্যাচারে হতাশায় তৈরী সে মানুষের জীবন। নিজের দিকে দেখলেন মার্ক্স—দেখতে পেলেন জঠরে আছে ক্ষুধা, দেহে আছে ব্যথার অনুভূতি—রক্তে শুনলেন সত্যিকারের মানুষের জীবনের গান।

"আমাদের মিলনের পথে আর কি বাধা আছে, জেনি—" পঁচিশ বছর বয়সের যুবক মার্ক্স হয়ত বলেছিলেন।

বাধা আছে বলে কি জেনিও মনে করেছেন কোনোদিন? জেনি তাঁর প্রণয়ীর বাইরের চেহারাকে ভালোবাসেননি—ভালোবেসেছিলেন তাঁর ভেতরকার ঝকঝকে উজ্জ্বল সত্তাকে।

১৮৪৩-এ তাঁদের বিয়ে হল।

র‍্যাবি-পরিবারের একটি ছেলেকে বিয়ে করলেন রাজভক্ত অভিজাত জার্মাণ পরিবারের একটি মেয়ে। এ-বিয়ের পরিণতি তখনকার সহস্র সহস্র জার্মাণ যুবকের অফলপ্রসূ জীবনের পরিণতিতেই পর্যবসিত হতে পারত—যদি বাস্তব অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে মার্ক্সের আদর্শগত মহত্তর জীবনের

ছোঁওয়ায় জেনি রোমাঞ্চিত হয়ে না উঠতেন। এই বিপ্লবী ছেলেটিকে ভালবাসবার জন্যে অভিজাত পরিবার থেকে জেনিকে কম লাঞ্ছনা পেতে হয় নি। তবু যাহোক বিয়ের আগে একটা আশার আলো দেখা গেল—মার্ক্সের বন্ধু আর্ণল্ড রুজ একটি কাগজের সম্পাদনার জন্যে মার্ক্সকে ১৫০০ শ' মার্ক করে বেতন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিয়ের পর মার্ক্স তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে এলেন রুজ-পরিকল্পিত 'ফ্র্যাঙ্কো—জার্মাণ ইয়ার বুক্‌স্‌'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে'। সে-যুগের প্যারিসকে বলা যায় 'আলোকের সহর'—সমস্তদেশের মননশীল বিদ্রোহীরা সেখানে গিয়ে জড় হয়েছিলেন। তখনো মার্ক্স পুরোদস্তুর সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠেন নি—মানুষের ভবিষ্যতের কোন বৈজ্ঞানিক পরিণতি তখনও তাঁর যুক্তিতে ধরা দেয়নি। তাঁর মনে ছিল সাধারণ একটা বিদ্রোহের রং—চলতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিরোধী সমালোচনায় জর্জরিত করাতেই যার পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রচলিত কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর মতো কোনো নীতিকে অভ্রান্ত বলে উপস্থিত করারও বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর সমালোচনার প্রধান বিষয়ই হয়ে উঠল জার্মেণীর ধর্ম আর রাষ্ট্রনীতি। মার্ক্সের বিচার-বুদ্ধি তখন মাত্র এটুকু আবিষ্কার করেই নিরস্ত ছিল যে রাষ্ট্র তার বিবর্তনের ইতিহাসে সামাজিক বিরোধ ও প্রয়োজনের চিহ্নই রেখে যায়। কাজেই মানুষকে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়াই হবে মার্ক্সের কাজ, সত্যের চেহারা উদ্‌ঘাটন করে দেখানো নয়। এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হতে যে অমানুষিক পড়াশুনো তাঁকে করতে হয়েছে তাতে বন্ধুরা তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। রুজ অনুযোগ জানিয়েছিলেন যে মার্ক্স অনেক সময়ই নাগাড়ে তিন চার রাত্রি বই নিয়ে বসে থাকেন—ঘুমোতে যান না।

প্যারিসের জীবন মার্ক্সের মানসিক জীবনকে অনেকদিক দিয়েই সমৃদ্ধ করে তুলল। সমাজের ভাঙাগড়ায় জার্মেণী ছিল অনেক পেছনে

পড়ে—প্রুশিয়ার রাজার একাধিপত্য তখনও জার্মেণীর সমাজকে বিকাশের পথে যেতে দেয়নি। কিন্তু প্যারিসের পেছনে তখন জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে ফরাসী বিপ্লব—সমাজে, রাষ্ট্রে মধ্যবিত্তের দাবী উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত। ইংল্যাণ্ডে যে-যন্ত্রশিল্পের বিপ্লব মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়েছে সে কথাও প্যারিসে তখন শোনা যায়। মানুষের সমাজের সম্পূর্ণ একটা রূপ উপলব্ধি করবার সুযোগ হল মার্ক্সের প্যারিসে এসে। সুযোগ হল বহু উদারপন্থী বিদ্বানের সঙ্গ লাভ করবার। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক প্রুঁধের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা তাঁর অতিবাহিত হয়েছে হেগেল আর সমাজতন্ত্রের আলোচনায়—বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁর কবি হাইনের সঙ্গে। আর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ—এঙ্গেল্‌সের বন্ধুত্ব —তারও সূচনা হয়েছিল মার্ক্সের প্যারিস-প্রবাসের দিনগুলোতেই। একটি সংখ্যা বেরিয়েই 'ফ্র্যাঙ্কো-জার্মাণ ইয়ার বুকস্‌' বন্ধ হয়ে যায়— 'ইয়ার বুকে'রই একজন লেখক হিসেবে এঙ্গেল্‌স্ ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে প্যারিসে এলেন মার্ক্সের সঙ্গে দেখা করতে। মার্ক্স যখন 'রাইনিশ্‌ ৎসাইটুং'-এর সম্পাদক ছিলেন, তখন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এঙ্গেল্‌স্ বিশেষ ভালো ব্যবহার পেয়ে আসেন নি—কিন্তু এখন আর সে ভয় তাঁব ছিল না। 'ফ্র্যাঙ্কো-জার্মাণ ইয়ার বুকস্‌' এ দুজনের লেখা থেকে বোঝা গেল তাঁরা ভিন্নগোত্রীয় নন। মতান্তর যখন নেই, মনান্তর আর হতে পারে না। অবশ্যি দুজনের একই রকম মনোভাব গড়ে ওঠবার যথেষ্ট কারণও ছিল। যদিও মার্ক্স থাকতেন প্যারিসে আর এঙ্গেল্‌স্ ম্যাঞ্চেষ্টারে, মার্ক্সের লেখায় রং দিয়েছিল ফরাসী বিপ্লব —আর এঙ্গেল্‌সের লেখার পেছনে ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব। একই ধাঁচের দু'টি ঐতিহাসিক পরিবর্তন সমাজে একই রকমের ছাপ এঁকে দেয়, কাজেই বুর্জোয়া সমাজের বিশৃঙ্খল স্বভাব অনায়াসেই দু'জনের চোখে ধরা পড়েছে। মার্ক্স তাই বললেন: "সামাজিক জীব হয়ে উঠলেই মানুষ মানুষের মুক্তির সন্ধান দিতে পারবে।" এঙ্গেল্‌স্ অন্য ভাষায় একই কথা বললেন: "আলাদা ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে

না ভেবে যদি সমাজ-সচেতন জীব বলে ভাবা যায় তাহলেই তৈরী-করা বিরোধগুলো ঘুচে যাবে।"

পরেকার জীবন মার্ক্সের সত্তার অর্ধেকখানি ছিলেন এঙ্গেল্‌স্—কাজেই এঙ্গেল্‌স্‌কে আমাদের ভালো করে জানা দরকার।

এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্সের চেয়ে বয়সে দু'বছরের ছোট ছিলেন—জার্মেণীর ধর্মের পীঠস্থান বার্মেনে তাঁর জন্ম হয়। বড়লোকের ছেলে—মদ খেয়ে ফুরতি করার দোষও তাঁর বাকি ছিল না। মার্ক্সের মতই কবিতার দিকে তার ঝোঁক ছিল—কিন্তু অল্পদিনেই সে ঝোঁক কেটে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে কাব্যদেবীর মালা তার গলার জন্য তৈরী হয়নি। ফরাসীর জুলাই বিপ্লবের ( ১৮৩০ ) আদর্শে কবি হাইনে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন—তার প্রতিও গোড়ায় তাঁর বিদ্বেষই ছিল, কিন্তু হাইনের 'ইয়ং জার্মেণী' সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উপর যখন গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ চলতে লাগল তখন তিনি বেঁকে বসলেন—নিজেকে ঘোষণা করলেন 'ইয়ং' জার্মাণ বলে। তাহলে কিন্তু হাইনের প্রভাব তার জীবনের বাঁক ফিরিয়ে দেয়নি। বাইবেলের ধর্ম মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন তিনি হেগেলের স্পর্শ পেয়ে। ১৮৪২-এ সৈন্য-বিভাগে কাজ করবার সময় হেগেলের পরিপন্থীদের বিরুদ্ধে হেগেলকে সমর্থন করে ছদ্মনামে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তা পড়ে বাম-পন্থীদের ধারণা হল ওটা রুশীয় বিপ্লবী বাকুনিনের লেখা : তারা মন্তব্য করলেন : "এই তরুণ লেখক বার্লিনের বুড়ো গাধাদের উদোম করে দিয়েছেন।" এক-বছর সৈন্যবিভাগে কাজ করার পর এঙ্গেল্‌স্ 'এরমেন এণ্ড এঙ্গেল্‌স্'-এর সুতোর কারখানায় কেরাণীর কাজ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। সে কোম্পানীর তার বাবা ছিলেন একজন অংশীদার। ইংল্যাণ্ডে যাবার আগে মোজেস্ হেস্ থেকে তিনি কম্যুনিজমের শিক্ষা পেয়ে যান।

বুর্জোয়া বিপ্লবের পুরোণো ঘর ইংল্যাণ্ডে একুশ মাস বসবাস করে

এঙ্গেল্‌সের হেগেল-পড়া মন সেখানকার অর্থনীতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল হয়ে নিয়েছিল। আর তাই তিনি 'ইয়ারবুকে'র পাতায় জাতীয় অর্থ-নীতির এমনই কঠোর ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করলেন যা পড়ে খুঁত-খুঁতে মার্ক্সও মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। মুগ্ধ হবার অবশ্যি কারণও ছিল। এঙ্গেল্‌স্ বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশ্লেষণে যুক্তির পথে প্রুধঁকেও অনেক পেছনে ফেলে গিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের আদর্শবাদী সমাজ-তান্ত্রিক আওয়েন-এর 'নিউ মরেল ওয়ার্লড্' কাগজেও তিনি য়ুরোপের সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন।

প্যারিসে মার্ক্স আর এঙ্গেলস্ বসে বসে সমানে দশদিন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করলেন—একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল তাঁদের মন—কারু মনে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহের বিন্দুমাত্র মেঘও আর লেগে রইলনা।

'ফ্রাঙ্কো-জার্মাণ ইয়ার বুক্‌স্' কিন্তু এক খণ্ড বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেল। উদারপন্থী হলেও রুজ ছিলেন খাঁটি ব্যবসায়ী। জার্মেণীতে বইটার প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—কাজেই টাকা পয়সার দিক থেকে বইটা রুজকে ভীষণ হতাশ করল। রুজ মার্ক্সকে চুক্তি অনুযায়ী টাকা না দিয়ে অবিক্রীত কতকগুলো বই গছিয়ে দিলেন।

প্যারিসে জার্মেণীর বিপ্লবী পলাতকদের একটি কাগজ ছিল—নাম Vorwarts—ফরোয়ার্ড—সাইলেসিয়ার তন্তুবায়-বিপ্লব উপলক্ষে রুজ সে কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখেন যার প্রতিপাদ্য ছিল একথা যে রাষ্ট্র-নৈতিক জ্ঞান জার্মাণ জাতির নেই, কাজেই সামাজিক সমস্যা জার্মাণরা বুঝতে পারে না—শ্রমিক-সমস্যা সম্বন্ধে জার্মেণী অচেতন, কেননা ইংল্যাণ্ড বা ফরাসীর চেয়ে জার্মেণী অনেক পেছনে পড়ে আছে—অনর্থক বোকামি আর রক্তপাতেই তাই জার্মাণ বিপ্লব পর্যবসিত হবে।

মার্ক্সের কাছে মনে হল এ শুধু নিছক মূর্খতা। তিনি রুজের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন—Vorwarts এর 'মার্জিন্যাল নোটস্' প্রবন্ধে। তিনি প্রতিবাদ করলেন: "সামাজিক সমস্যা রাষ্ট্রিক সমস্যা নয়—রাষ্ট্র

তার মীমাংসা করে না। রাষ্ট্র-চেতনা মনে যতই বেড়ে যায় সমাজ ততই সে-মন থেকে দূরে পড়ে থাকে। রাষ্ট্র এমনই একটা ব্যাপার যা 'মানুষ' এই সাধারণ কল্পনার সঙ্গে মানুষের বাস্তব অস্তিত্বের বিরোধ ঘটিয়ে দেয়। রাষ্ট্রসচেতন মন সামাজিক দারিদ্র্যও বুঝতে পারে না—ম্যাল্‌থাসের মতো বলে দারিদ্র্য প্রাকৃতিক নিয়ম।"

রুজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে ব্রুনো বাওয়ারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলেন মার্ক্স—এ কাজে সঙ্গী পেলেন তিনি এঙ্গেল্‌স্‌কে। 'অলজিমাইনে লিটারেচার-ৎসাইটুং' কাগজের মারফত বাওয়ারদের তিন ভাই ইয়ার-বুকের মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের সিদ্ধান্ত নিয়ে কটুকষায় সমালোচনা করে চলছিলেন। প্রুধঁকে বিগড়ে দিয়েই তাঁরা নিরস্ত ছিলেন না—হেগেলের উপরও তাঁরা এককাঠি চড়ে বসেছিলেন। জনসাধারণের ভেতর—সমাজের অধিকাংশ লোকের ভেতর—শ্রমসর্বস্বদের ভেতর তাঁরা কোনো মনের খেলা দেখতে পেলেন না,—এমন কি কোনো মূল্যই তাদের উপর আরোপ করতে চাইলেন না। সম্ভবত মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌ গোড়ায় ভেবেছিলেন যে একটা ছোট পুস্তিকায় ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে তাঁরা ব্রুনো বাওয়ারের জবাব দেবেন। এঙ্গেল্‌স্‌ ষোল পাতার মধ্যে একটা জবাব লিখেও ফেললেন—কিন্তু দেখা গেল মার্ক্স ইতিমধ্যে ৩০০ পাতা শেষ করে ফেলেছেন। আরো অবাক হলেন এঙ্গেল্‌স্‌, যখন ছাপা বই-এ দেখা গেল যে তাঁর এই অকিঞ্চিৎকর দান সত্ত্বেও, বইটাতে মার্ক্সের নামের উপর তাঁর নাম ছাপা হয়েছে।

বইটির নাম হ'ল 'হোলি ফ্যামিলি'—এ নামকরণ অবশ্যি প্রকাশকের ইচ্ছাতেই হয়েছিল। প্রকাশকের ধারণা ছিল বাওয়ার পরিবারের উপর বইএর এই নাম বিদ্রূপের একটা কটাক্ষ করবে। 'হোলি ফ্যামিলি'-তে মার্ক্স হেগেলের দর্শনের বিরোধিতা করে প্রুধঁর অর্থনৈতিক বিচারকেই সমর্থন করে গেলেন। হেগেলের বিরুদ্ধে ফয়ারব্যাকের মানবতাকে দিয়ে সুরু করে মার্ক্স বললেন: "কেবল শ্রমসর্বস্বরাই নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে পারে, দারিদ্র্যের আকর

হিসেবে নিজেদের নির্মূল করতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করে দিয়ে দারিদ্র্যের কারণ মুছে ফেলতে পারে। শ্রমসর্বস্বের বিপ্লবেই সমস্ত রকম বিপ্লব নিহিত আছে।”

নদীর জল পেছনের দিকে তাকায় না, পাহাড়ের স্মৃতি, সমতলের স্পর্শ ভুলে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে চলে সমুদ্রের পরিণতির দিকে। মার্ক্সও প্রবল গতিবেগে এগিয়ে চলেছিলেন জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্বাভাবিক পরিণতিতে। জলের মত তাঁর মনের স্বাভাবিক ধর্মই ছিল পরিণতির সন্ধান—যতদিন না তা পেয়েছেন ততদিন তাঁর অন্তরের আবেগ কিছুতেই তাঁকে নিশ্চল নিশ্চুপ থাকতে দেয়নি।

‘হোলি ফ্যামিলি’ প্রকাশিত হবার আগেই Vorwarts-এর প্রবন্ধের জন্যে মার্ক্সের উপর পুলিশের নজর পড়ল। প্রুশীয় সরকারের অনুরোধে ফরাসীর উদার-রাজা লুই ফিলিপ এ সব রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। মার্ক্সের উপর ফরাসী থেকে অন্যত্র চলে যাবার আদেশ জারী হল। বার্মেন থেকে এঙ্গেল্‌স্ এই বহিষ্কারের আদেশ শুনলেন। একটা মোটা রকমের চাঁদা তুলে তিনি মার্ক্সের পথ-খরচার জন্যে তা পাঠিয়ে দিলেন—আর অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের নিয়ে লেখা বইটির পারিশ্রমিক বাবদ তিনি যা পাবেন তার সমস্তটাই মার্ক্সের হাতে তুলে দেবেন। কেননা তাঁর নিজের তাতে প্রয়োজন নেই—দরকার মত টাকা বুড়োর ( বাবার ) কাছে চাইলেই তিনি পান।

রাষ্ট্রনীতিতে মাথা ঘামাবেন না এমন একটা কবুল-পত্র সই করে দিলেই মার্ক্স অনায়াসে প্যারিসে থাকতে পারতেন—কিন্তু তাহলে তাঁর জীবনকেই ভুলে যেতে হয়। তাই যদি করবেন তিনি—এত নিরিবিলি চুপচাপই যদি জীবন চালিয়ে নেবেন—তবে ত বাবার আদেশে আইন পড়ে একটা সরকারী চাকরীতেই বহাল হতে পারতেন।

আমরা অনুমান করতে পারি—সপরিবারে মার্ক্স প্যারিস থেকে ব্রুসেলে চলেছেন—ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়—প্যারিস তাঁকে ঠাঁই দিলে না, তাই। কিন্তু তাতে সামান্য অনুযোগ, বিন্দুমাত্র দুর্বলতা তাঁর নেই —তাঁর দীর্ঘ আয়ত চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন। কোথায় আছে বিপ্লবীর ঠাঁই ?—এতো স্বাভাবিক ! স্বামীর বিপ্লবের স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে ছায়ার মতো সঙ্গে চলেছেন জেনি—ত্রেভেসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে, সবচেয়ে সমৃদ্ধ ঘরের মেয়ে জেনি। এ ভালোবাসার স্রোত কেবল দেহের তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে না—প্রত্যক্ষ দেহের বাইরের মানুষের যে মননশীল সত্তা, সেখানেই তার উৎস—তাই কোনো সময়েই, কোনো দিকেই সে-স্রোতের গায়ে ভাটার টান আসে না।

ব্রুসেলে এসেও মার্ক্সের নিস্তার ছিল না—রাজরোষ এখানেও তাঁকে তাড়া করল। বেলজিয়াম সরকার তাঁকে দিয়ে কবুল-পত্র লিখিয়ে নিলেন যে ওদেশের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে পারবেন না। শুধু তাই নয়—প্রুশীয় সরকার মার্ক্সকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষকে উপর্যুপরি অনুরোধ জানাতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে মার্ক্স প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব বর্জন করলেন। সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মার্ক্সের আর নিজের বলতে কোনো দেশ ছিল না। সত্যি বলতে কি, সমাজতান্ত্রিকের ত দেশ নেই—বসুধাই তার কুটুম্ব।

ব্রুসেলে এসে এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্সের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর দুজনেই তাঁরা দু'সপ্তাহের জন্যে ইংল্যাণ্ডে গেলেন। মার্ক্সের উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের কিছু অর্থনীতির বই পড়ে আসবেন। এ ভ্রমণে ইংল্যাণ্ডের চার্টিষ্ট আর সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে পরিচয় হল মার্ক্সের।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে দুজনে মিলে একটি বই লিখতে সুরু করলেন। এই বইটির উদ্দেশ্যই ছিল জার্মাণ দর্শনের বিরুদ্ধে নিজেদের মতবাদের একটা স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন রূপ দেওয়া। তাকে অবশ্যি নিজেদের প্রাক্তন দার্শনিক বৃত্তির সঙ্গে হিসেব নিকেশ পরিষ্কার করে ফেলাও বলা যায়। বই লেখা হয়ে গেল—৮০০ পাতার বিরাট গ্রন্থ। কিন্তু

রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতায় প্রকাশক গেলেন পিছিয়ে। ওটাকে ইঁদুরের কৃপায় সমর্পণ করে মার্ক্স-এঙ্গেল্স্ চুপ করে রইলেন। চুপ করে রইলেন এজন্যে যে তাঁদের যা উদ্দেশ্য ছিল—তা একরকম সিদ্ধই হয়ে গেল। মনের সঙ্গে নিজেদের ভালভাবেই বোঝাপড়া হয়ে গেল তাঁদের।

বইটি 'দি জার্মাণ ইডিয়োলজি' নামেই পরিচিত। ইঁদুরের দাঁত থেকে যতটা বেঁচেছে তাতে দেখা যায় যে জার্মেণীর তখনকার সমাজতান্ত্রিক পীর আর দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রের সত্যিকারের চেহারার একটা খসড়া বইটিতে আছে। বামপন্থী হেগেলীয় দার্শনিক ফয়ারব্যাকের উপর আক্রমণটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কেননা ফয়ারব্যাকের সমর্থক ও মতাবলম্বী বলে মার্ক্স আর এঙ্গেল্স্ একদা সুপরিচিত ছিলেন। ধর্মমূলক মতবাদকে উচ্ছেদ করে ফয়ারব্যাক নৃতত্ত্বের পথে মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু অর্দ্ধপথেই তিনি থেমে গেছেন—প্রাকৃতিক ইতিহাসের জীব ছাড়াও যে মানুষ কর্মক্ষম সামাজিক জীব সেদিকে ফয়ারব্যাক চোখ ফিরিয়ে তাকান নি। তিনি হেগেলের সম্পূর্ণটুকু বর্জন করে বড় বেশি বর্জন করে ফেলেছিলেন। হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তন গ্রহণযোগ্য—তাকে ভাবরাজ্যের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বাস্তবরাজ্যে প্রয়োগ করাই সত্যিকারের জড়বাদীর কাজ। পুরোণো জড়বাদী দার্শনিকরা সে-কাজে অক্ষম। "দার্শনিকরা বিভিন্ন ভাবে জগতের ব্যাখ্যা করেছেন—আমাদের কাজ তাকে বদলে ফেলা—" দার্শনিকদের সঙ্গে এই পথান্তর ঘোষণা করলেন মার্ক্স।

জার্মেণীতে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের স্বরূপকে কঠোর সমালোচনায় বিধ্বস্ত করে সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নিরূপণ করাই হল বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের মর্ম। জার্মেণীর ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতেই জার্মাণ সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের মতবাদ গঠন করে চলছিলেন, অতীতের সামাজিক অবস্থার রূপ এবং রং-এর উপরই যে ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এ ধারণা

তাঁদের ছিল না। ব্রুনো বাওয়ারের উপলক্ষে হেগেলকেও জড়িয়ে—যুগপ্লাবী ভাববাদী দর্শনকে আঘাত করলেন মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স্‌। ষ্টারর্ণারের সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্স মানুষের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ব্যাখ্যাটি এখানেই প্রথম উপস্থিত করে বললেন : "চেতনা দিয়ে জীবন শাসিত নয়—বরং জীবনই চেতনার নিয়ামক।"

পরবর্তী মার্ক্সীয় মতবাদের গোড়াপত্তন হ'ল এই বইটিতে। যদিও তখন পর্যন্ত ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদের দিকে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌ চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকান নি—বরং তাঁদের প্রশংসাতেই ছিলেন মুখর, কিন্তু সমাজতন্ত্রের পথে চলতে গিয়ে দেখা গেল ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদের পথেও গলদ আছে। শ্রমশিল্পের চরম বিকাশ হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে—বুর্জোয়া-সমাজের রূপ এবং শ্রমসর্বস্বদের চেহারা সেখানেই ছিল সব চেয়ে স্পষ্ট। ইংল্যাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য পড়ে এবং এঙ্গেল্‌সের সাহচর্য্যে মার্ক্স সমাজতন্ত্রের আসল রূপটাকে ক্রমেই পরিষ্কারভাবে কল্পনা করে নিয়েছিলেন—তাই প্রুধঁও এসময়ে তাঁর মনে আর ত্রুটিহীন হয়ে রইলেন না।

সেদিনের ফরাসীতে প্রুধঁ ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছাপাখানার একজন সামান্য কম্পোজিটার ছিলেন তিনি কিন্তু জ্ঞান-চর্চায় ক্রমে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান হয়ে উঠলেন। কাণ্ট্‌, হেগেল, ফয়ারব্যাকের দর্শন পড়তেও তাঁর বাকি ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে ফরাসীর যন্ত্রশিল্পের বিপ্লব সমাজে যে নূতন রং চড়াতে সুরু করেছিল তাকে উপলব্ধি করবার দৃষ্টি ছিল তাঁর অসাধারণ। এতখানি মানসিক সম্পদ নিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দেই জীবন যাপন করতে পারতেন কিন্তু নিজের শ্রেণীকে তিনি ভুলে থাকতে পারেন নি—চোখ বুঁজে থাকতে পারেন নি নিজের শ্রেণীর দারিদ্র্যের দিকে। একটা উলের জামা গায়ে আর খড়ম পায়ে-ই তিনি প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন সমস্ত য়ুরোপে যখন

তাঁর টি-টি নাম। প্রুধ'ই বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন: "Property is theft"—"সম্পত্তি করার মানে চুরি করা।" কিন্তু এমন একটি ভাব-ঋদ্ধ মনও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মূলে যেতে পারল না। ফরাসী ইতর-বুর্জোয়ার মনোভাব নিয়ে তিনি পরে মার্ক্সকে উপদেশ দিতে গেলেন: "গোড়ামির বিরোধী আমি। মানুষকে নূতন কাজে মাতিয়ে তোলবার পক্ষপাতী নই। আমরা সহ্যশক্তির উদাহরণ দেখিয়ে যাব জগতকে। সম্পত্তি নিয়ে অগ্নিকাণ্ড করবার দরকার নেই —ধীরে ধীরে আগুনে ওটা পুড়ে যাবে।" প্রুধে'র এই যুক্তিহীন, বিপ্লব-পরিপন্থী মনোভাব মার্ক্সকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। মার্ক্স তখন প্যারিস ও লণ্ডনের সমাজতান্ত্রিক 'সত্য সঙ্গে' যোগদান করে কাজ করতে লেগে গেছেন—ক্রেগ-প্রচারিত আমেরিকার মেকী সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর কটূক্তি বর্ষণ করেছেন—আর ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন জার্মেণীর সংস্কৃতিবান সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক উইটলিং-এর উপর, যিনি ব্রুসেলে একটা পার্টি-মীটিং-এ মার্ক্সের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করে এখন ক্রেগকেই সমর্থন করে যাচ্ছিলেন। প্রুধ'কেও উল্টো গাইতে দেখে মার্ক্সের সমালোচক মন স্থির করে ফেলল যে এবার প্রুধে'র পালা। প্রুধে'র লেখা 'ফিলসফি অব্ পোভার্টি'—'দারিদ্র্যের দর্শন' বইটি হাতে নিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকালেন মার্ক্স। তাতে দেখা গেল লেখক হেগেলীয় দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তন বস্তুটিকে ভুল বুঝেছেন, তাছাড়া বহু অর্থনৈতিক বিষয়েও বহু ত্রুটী রয়ে গেছে। প্রতিবাদে মার্ক্সের যে লেখা বেরুল তার নাম—'পোভার্টি অব্ ফিলসফি'—'দর্শনের দারিদ্র্য'। কটূক্তির ভেতর দিয়ে এই বইটিতে মার্ক্স সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐতিহাসিক জড়বাদের গোড়াপত্তন করলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ডারউইনের দান যতটুকু এই বইটির মারফৎ মার্ক্স ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে ঠিক ততটুকু দান রেখে গেছেন। 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র লেখককে মনে হয়েছিল—অর্থনীতিজ্ঞ রিকার্ডো যেন সমাজতান্ত্রিক বনে গেছেন—আর হেগেল হয়ে উঠেছেন অর্থনীতিজ্ঞ।

ফয়ারব্যাকের চেয়ে অনেক বেশি দূরে তাকিয়ে দেখলেন মার্ক্স—সেখানে পেলেন আবার তিনি হেগেলকে। তখনকার হেগেলীয় দলের হেগেল এ নয়। এ যেন মার্ক্সের নূতন আবিষ্কার—হেগেলকে সম্পূর্ণ উলটিয়ে দিলেন তিনি—হেগেল যে আসনে 'ভাব'-কে বসিয়েছিলেন মার্ক্স সে-আসনে বসালেন 'বস্তু'কে—তারপর বস্তু দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনের পথে তৈরী করে চলল মানুষের ইতিহাস। সে ইতিহাসেরই একটি ধাপ ধনতান্ত্রিক সমাজ—তাতে দুটি বিরোধী বস্তু বা শ্রেণী দেখা যায়, শ্রমসর্বস্ব আর পুঁজিবাদী। শ্রেণীদ্বন্দ্ব চরমে উঠলেই তাকে বলে বিপ্লব—সামাজিক আন্দোলন আর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন পৃথক নয় কারণ কোনো রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনই সমাজকে বাদ দিয়ে হয় না। শুধু শ্রেণীহীন সমাজে সামাজিক বিবর্তনকে আর রাষ্ট্রিক বিপ্লব বলা হবে না কিন্তু তার আগে, সামাজিক পরিবর্তনের মুখে সমাজ-বিজ্ঞান চিরদিনই বলবে: "জয় কিম্বা মৃত্যু—রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কিংবা ধ্বংস।"

সে যুগে কাগজপত্রে অনেকেই বিপ্লবী ছিলেন আবার এমন বিপ্লবীরও অভাব ছিল না যাঁরা বুঝতেন শুধু কাজ। মার্ক্স কোনো দিকই বাদ দিলেন না—মেধা আর পেশী দুইই তাঁর অনলস ছিল। একদিকে যেমন শ্রমিকের মুক্তির জন্যে তিনি তখনকার কুয়াশাচ্ছন্ন মতবাদের সঙ্গে মস্তিষ্কের যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন আবার তেমনি 'কম্যুনিষ্ট লীগ' স্থাপন করে বিপ্লবের আয়োজনও সম্পূর্ণ করে আনছিলেন। পূর্ব-পরিচিতের মধ্যে অনেকেই এ-সময়ে তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল—কিন্তু সব সময়েই পাশে ছিলেন একনিষ্ঠ সুহৃদ এঙ্গেল্‌স্।

১৮৪২-এর ইংল্যাণ্ডে যে ব্যাপক ধর্মঘট হল, তার অনিবার্য স্রোত রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা আভাস এনে দিল য়ুরোপের দেশে-দেশে। ১৮৪৩-৪৪-এ জার্মেণী অনুভব করল বিপ্লব আসন্ন—যন্ত্র-শিল্পের কেন্দ্রগুলো সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় ভরে উঠল। সমাজতন্ত্রের নূতন রং-এ ফরাসী সাহিত্যের চেহারাই হয়ে দাঁড়াল অন্যরকম। য়ুরোপের আকাশে বাতাসে তখন শুধু কম্যুনিজম্ ভেসে বেড়াচ্ছে। ১৮৪৮-এ ফ্রেডারিক

চতুর্থ উইলিয়মের 'একীকরণ পরিকল্পনা'—জার্মাণ-বিপ্লবের সঙ্কেতধ্বনি করে উঠল। জার্মাণ রাজ্যগুলো তখন আর বিযুক্ত নয়—রেল, টেলিগ্রাফ, যন্ত্রশিল্পের প্রসারে গোটা জার্মেণীর মাটি সমস্বরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে জনসাধারণের দারিদ্রের চীৎকার —বেড়ে যাচ্ছে শ্রমিক-মজুরের জীবনের তিক্ততা। ইংল্যাণ্ডে কলরব উঠল: "ফ্যাক্টরী বাড়ালেই দারিদ্র্য বাড়বে"—"জনসাধারণের রাষ্ট্রিক অধিকার বাড়াও—তাই মুক্তির পথ।" সে-যুগের ইংল্যাণ্ড বা ফরাসীতে যাঁরা বাস করে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের এ-কথা না ভেবে উপায় ছিল না যে সমাজ-বিপ্লব সন্নিকট। সেই বিপ্লবের পদধ্বনি —সহস্র সহস্র শ্রমিক-মজুরের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির তুমুল নিনাদ সমসময়েই মার্ক্স মনে মনে শুনতে পেয়েছেন। চোখে দেখতে পেয়েছেন মানুষের মুক্তির সূর্যোদয় আসন্ন।

'কম্যুনিষ্ট লীগে'র কেন্দ্রীয় সমিতি মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌স্-কে এ সময়ে একটি কাজের ভার দিলেন। কাজটি হল জনসাধারণের জন্যে কম্যুনিজম-এর মূলসূত্রগুলো লিখে দেওয়া। বিখ্যাত 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' তৈরী হল। এতে এমন কিছু নূতন জিনিষ ছিল না, যা মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ আগে বলেন নি। শুধু এ বইটিতে সমাজ-সম্বন্ধে লেখকদের ধারণাকে নূতন ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হল—একে বলা যায় 'একটি আর্সি যার কাচ ততটুকুই পরিষ্কার যার চেয়ে বেশি পরিষ্কার হতে পারে না, ফ্রেমও আর তার চেয়ে ছোট হতে পারে না।' পুস্তিকাটির মূল সত্যের অভ্রান্তিকতায় আজ পর্যন্ত এর মূল্যের তারতম্য হয়নি—আজও এর ঘোষণা ইতিহাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: "দুনিয়ার মজুর এক হও।"

১৮৪৮-এ দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব লুই ফিলিপের রাজত্বের অবসান করে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সে-বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েই বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড উদারপন্থী মন্ত্রীদের ডেকে

বললেন যে দেশ যদি চায় তিনি সিংহাসন ছাড়তে প্রস্তুত। রাজ-বাক্যে বুর্জোয়া রাজনীতিজ্ঞরা গদগদ হয়ে মনের বিদ্রোহ মনেই চেপে ফেললেন। গদী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজা সৈন্য লেলিয়ে সভা-সমিতিগুলো ভাঙতে লাগলেন আর পুলিশ লাগিয়ে দিলেন বিদেশী পলাতকদের টেনে বার করতে। সস্ত্রীক মার্ক্সকে গ্রেপ্তার করা হল। শুধু তাই নয়—একরাত্রির জন্য মার্ক্সের স্ত্রীকে বেশ্যাদের সঙ্গে আটক করে রাখা হল। দারিদ্র্যের পীড়ন থেকেও কঠোর এই একটি রাত্রির পরীক্ষা হয়ত জেনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে এলেন—কারণ তিনি জানতেন যে বিপ্লবীর স্ত্রীর গায়ে বৈপ্লবিক আগুনের তাপই এসে লাগে না, লাগে তার প্রতিক্রিয়ারও দাহ।

মুক্তি পেলেন বটে মার্ক্স কিন্তু বিতাড়িত হলেন ব্রুসেল্স থেকে। অবশ্যি ব্রুসেল ছেড়ে তখন চলেই যেতেন তিনি, কেননা ফরাসীর নূতন গণতন্ত্রে শ্রমিকরাও ঠাঁই করে নিয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকেই তাঁর আমন্ত্রণ এলো: "একনিষ্ঠ বীর মার্ক্স, মুক্ত ফরাসী আপনার জন্য দ্বার খুলে রেখেছে।"

কম্যুনিষ্ট লীগের নেতৃত্বের ভার নিয়ে মার্ক্স প্যারিসে এলেন। প্যারিসে তখন জার্মাণ বিপ্লবীদের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা। তাঁরা বললেন, জার্মেণীর বৈপ্লবিক রূপান্তর আনবার জন্যে জার্মেণীকে তাঁরা সশস্ত্র আক্রমণ করবেন। প্যারিসের অস্থায়ী রাষ্ট্রপরিষদও এই পরিকল্পনায় ইন্ধন যোগাতে স্যুরু করল। কিন্তু একটি জনসভায় মার্ক্স এতে আপত্তি জানালেন। এই বৈপ্লবিক মূর্খতায় তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি দেখছিলেম জার্মেণীর সত্যিকারের বিপ্লব একমাত্র শ্রমিকদের দিয়েই সম্ভব। প্যারিসে থেকেই সে-বিপ্লবের আয়োজন করতে স্যুরু করলেন মার্ক্স: জার্মাণ শ্রমিকদের দাবীর একটা খসড়া তৈরী হল—প্যারিসে যে জার্মাণ শ্রমিকেরা ছিল তাদের এক এক করে জার্মেণীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন যাতে তারা দেশে ফিরে গিয়ে বিপ্লবের কাজ এগিয়ে দিতে পারে। তার ফলও হল চমৎকার। কয়েক মাসের

মধ্যেই বৈপ্লবিক প্রচারে ও আন্দোলনে জার্মেণীর আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের আগুন উৎপীড়ন-জর্জর য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়তে খুব দেরী হয় নি। সজোরে প্রতিধ্বনি বেজে উঠল প্রথম ভিয়েনায়। রাষ্ট্র-ধুরন্ধর মেত্তারনিক লণ্ডনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর পলায়নের খবরে সমস্ত য়ুরোপ আবার যেন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চাইল। অষ্ট্রিয়ার সৈন্যের সঙ্গে মিলানের লোকেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাগাড়ে পাঁচদিন যুদ্ধ চালিয়ে গেল—অষ্ট্রিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ পালিয়ে বাঁচলেন। জার্মেণীর রাজ্যগুলোতেও সুরু হল তুমুল আন্দোলন—কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আন্দোলনের মূলে এটুকু দাবী মাত্র ছিল যে রাজার ক্ষমতা কমে যাক—জার্মেণী যুক্ত হোক আর সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা থাক। কিন্তু বার্লিনে এ-বিপ্লবের রং আলাদা। উত্তেজিত জনতার দুশোর উপর লোককে বন্দুকের গুলিতে খতম করে চতুর্থ উইলিয়ম ঠাণ্ডা হয়ে আপোষ মীমাংসা করতে এগুলেন। তার ফলে একটি উদারপন্থী মন্ত্রীসভা তৈরী হল। তারপর এল জার্মাণীকে একীকরণের পালা। সমস্ত রাজ্যের সম্মিলিত ইচ্ছায় একটি জাতীয় পরিষদ গড়ে উঠল, ইতিহাসে যা 'ফ্র্যাঙ্কফোর্ট এসেম্ব্লি' বলে বিখ্যাত।

প্যারিস ছেড়ে এবার মার্ক্স রাইনল্যাণ্ডে এলেন। এঙ্গেল্‌স্ আবার একটি কাগজ বার করেছিলেন—'নিউ রাইনিশ ৎসাইটুং'—তার প্রধান সম্পাদক রূপে দেখা গেল মার্ক্সের নাম। কাগজটির এক বছরের জীবন শুধু এ কথাটাই বারে বারে ঘোষণা করে গেছে যে শ্রমিকের মুক্তি বা শ্রমিক-বিপ্লব আর বেশি দূরে নেই। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা হরণের যে চেষ্টা করছিল জার্মেণী, সেই স্বার্থপর স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতি-বাদের কণ্ঠ তুলতেও 'নিউ রাইনিশ ৎসাইটুং' ভয় পায়নি—আবার তেমনি রুশিয়ার জারকে ধ্বংস করবার জন্যও জার্মেণীকে তা উদ্দীপিত করে তুলেছে। হঠাৎ মনে হতে পারে এ রকম দুটি বিপরীত মত কি করে

মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌স্ সমর্থন করে গেলেন। তার কারণ আর যুক্তি দুটোই ছিল। প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রনায়ক জার যেহেতু প্রুশিয়াতে আবার স্বৈরাচার প্রবর্তন করবার সঙ্কল্প করেছিলেন তারি জন্যে 'নিউ রাইনিশ ৎসাইটুং' ঘোষণা করল: "অষ্ট্রিয়ার আর প্রুশিয়ার রাষ্ট্র-স্বৈরতাকে ধ্বংস করতে না পারলে জার্মাণ বিপ্লব জয়ী হতে পারবে না—এবং এই রাষ্ট্র-স্বৈরাচার ধ্বংস হবে না জারের পতন না হলে।"

ত্রিশ বছর বয়সের একটি যুবক—প্রশস্ত ললাট, জ্বলজ্বলে কালো চোখ, কালো চুল আর দাড়ি—মজবুত শরীর। গণ-আন্দোলনের অকুণ্ঠিত বাণী তাঁর মুখে—সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার নেতা তিনি। তাঁর বড়ত্বেই লোক মুগ্ধ হয় না—বিশাল ব্যক্তিত্ব লোককে মুগ্ধ করে ফেলে। মতবাদ সম্বন্ধে মার্ক্সের অসহ্য আন্তরিক ঔদ্ধত্য, বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা, এসব সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করত না তখনকার বিপ্লবী য়ুরোপ।

কিন্তু মার্ক্সের বিপ্লবকে সহ্য করবার মতো অবস্থা তখনও জার্মেণীর দাঁড়ায়নি। 'নিউ রাইনিশ ৎসাইটুং'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর লোকেরা গ্রেপ্তার হলেন কেউ—কেউবা পালিয়ে বাঁচলেন। পত্রিকা বন্ধ করবার হুকুম হল। আবার সে-হুকুম যখন তুলে নেওয়া হল তখন দেখা গেল টাকা পয়সার ভীষণ টানাটানি। মার্ক্স তখন নিজে এ-কাগজের ভার নিলেন—ভার নেওয়ার মানে পৈতৃক যা কিছু ছিল তা-ও এবার এর পেছনে দিতে হল। মার্ক্স সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে পুরোপুরি ফতুর হলেন আন্দোলন আর কাগজটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। কিন্তু তা দিয়েও কাগজ বাঁচল না—পরিবারের খাওয়া পরা চলতে লাগল গায়ের অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে। তার উপর দেশ ত্যাগ করে যাবার আদেশ জারী হল মার্ক্সের উপর। মার্ক্স আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। কিন্তু প্যারিসেও তখন প্রতি-বিপ্লবের জোয়ার চলছে—রাষ্ট্রের উপর পড়েছে রাজতন্ত্রের ছায়া। কাজেই প্যারিসেও দেখা গেল মার্ক্সের জন্য ঠাঁই নেই। প্যারিসের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী হুকুম করলেন মার্ক্সকে প্যারিসের

পাট তুলে অস্বাস্থ্যকর জায়গা মোর্বিহানে গিয়ে থাকতে। মার্ক্স এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে পত্র বিনিময় করে ঠিক করলেন লণ্ডন গিয়ে তাঁরা একটি জার্মাণ কাগজ প্রকাশ করবেন।

বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্স ছিলেন অতিমাত্রায় আশাবাদী। কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত য়ুরোপ বিপ্লবের আগুনে জ্বলে উঠবে—এই ছিল তাঁর ধারণা। প্রত্যেক দেশে তখন যে অসন্তোষ আর বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তা থেকে একটি বিপ্লবী মন স্বাভাবিকভাবেই এ আশা করতে পারে। এই অসন্তোষকে নিবিড় করে তুলে বিপ্লবের পথে চালিয়ে দেওয়াই নেতার কাজ। তাই মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌স্ খুব জাঁকাল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লণ্ডন থেকে 'নিউ রাইনিশ রিভিয়ু' বার করলেন। কিন্তু য়ুরোপে তখন বিপ্লবের স্রোতে ভাটার টান এসেছে। কাগজটির তাই আশানুরূপ কাটতি হল না—তা ছাড়া পয়সার টানাটানির জন্য জন্ম থেকেই এর আবির্ভাব হয়ে উঠল অনিয়মিত। ছ'টি সংখ্যা বেরিয়েই 'নিউ রাইনিশ রিভিয়ু' বন্ধ হয়ে যায়।

প্যারিস থেকে যখন মার্ক্স রাইনল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন তখনই তাদের 'কম্যুনিষ্ট লীগে'র কাজ বন্ধ হয়ে যায়। লণ্ডনে এসে আবার তারা 'কম্যুনিষ্ট লীগ' স্থাপন করলেন। এ সময়েই উইলহেল্‌ম লাইব্‌নেক্ট এসে লীগে যোগদান করেন। 'কম্যুনিষ্ট লীগে'র পক্ষ থেকে মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌স্ জার্মেণীর বিপ্লবের এই পথনির্দেশ পাঠিয়ে দেন: বিপ্লবী শ্রমিকদল ইতর বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বে। নিজেদের সর্বাঙ্গীন সুবিধার সঙ্গে শ্রমিকদের জন্যও কিছুকিছু সুবিধা করে দেবার জন্যে ইতর বুর্জোয়ারা বিপ্লব চায়। শ্রমিকরা কিন্তু তা নিয়েই খুসী থাকবে না। ইতর বুর্জোয়ারা যখন ভাববে যে তাদের সব পাওয়াই হয়ে গেল—তখনও শ্রমিকদল বিপ্লবকে চিরন্তন করবার জন্যে অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যতদিন না বিত্তশীল শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয়, যতদিন না রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমসর্বস্বদের হাতে চলে আসে

এবং তা শুধু একদেশেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ দেশে যতদিন না এ ব্যবস্থা স্থাপিত হয় ততদিন পর্যন্ত বিপ্লবের অবসান হবে না।

কম্যুনিষ্ট লীগের এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করবার সুযোগ তখন আর য়ুরোপে নেই দেখা গেল। ফরাসীতে তখন সর্বসাধারণের নির্বাচন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে অথচ তাতে শ্রমিকদল টু শব্দটিও করেনি —জার্মেণীতে ইতর বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রনীতি বর্জন করেছে—সমস্ত জার্মেণী জারের আক্রমণ আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। বিপ্লবের এই ভাটার টানে চুপ করে রইলেন না মার্ক্স—তিনি ভাবলেন বিপ্লবকে মরতে দিলে চলবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এ নিয়ে 'কম্যুনিষ্ট লীগে'র সভ্যদের মধ্যে দলাদলি হয়ে গেল। বুর্জোয়া সমাজের সমৃদ্ধির দরুণ যে আপাতশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা লক্ষ্য করে 'নিউ রাইনিশ রিভিয়ু'র কণ্ঠ শেষ বারের মত এই বলে বেজে উঠল: "নূতন সঙ্কটই নূতন বিপ্লবের জন্ম দেবে—কিন্তু সে-বিপ্লব অনিবার্য, কেননা এ সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্কটকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌স্ এবার ঠিক করলেন নির্বাসিতের পক্ষে নির্জন বাসই ভালো। দলে যখন মতবিরোধ দেখা যাচ্ছে—সেখান থেকে সরে এসে লেখাপড়ায় চুপচাপ দিন কাটালে মন্দ কি? হৈ-হাঙ্গামায় না গেলেই যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেওয়া হল তা ত নয়, চার্টিষ্ট কাগজে প্রবন্ধ লিখে—আর আগেকার প্রবন্ধগুলো পুস্তকাকারে বার করে কিছুদিন নিরিবিলি রইলেন মার্ক্স। সে নিরিবিলি থাকা অবশ্যি তাঁর বাইরের জীবনে—কিন্তু পারিবারিক জীবনে তখন তাঁর প্রবল তুফান। দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে তখন পৌঁচেছেন মার্ক্স। মার্ক্সের স্ত্রীর চিঠি থেকে জানা যায়: তাঁদের একবছরের মেয়েটা মায়ের বুকের দুধ পায়নি—টেনে নিয়েছে দুশ্চিন্তা আর অশান্তি—তাই সুস্থ থাকা কাকে বলে তা সে জানে না। জার্মেণীতে রূপোর বাসনপত্র যা বন্ধক পড়েছিল তা বেচে দিয়ে উদ্বৃত্ত ক'টা টাকা পাঠিয়ে দিতে তখন মার্ক্স তাঁর বন্ধু ওয়েডমেয়ারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন—আর লিখে

পাঠাচ্ছেন তাঁর বড় মেয়ে জেনির চামচের বাক্সটা যেন বিক্রী করা না হয়। বাক্সটা বিক্রী করা হলে ব্যাপারটা যত করুণ দাঁড়াত তার চেয়ে এ-অনুরোধ ঢের বেশি করুণ। জীবনে যিনি বিপ্লবের দিকে ছাড়া আর কারো মুখের দিকে চাননি—তিনি যে তাঁর ছোট ছোট ফুটফুটে মেয়েগুলোকে খাওয়াতে পারছেন না, সেই ব্যথা তাঁর এই অনুরোধের পেছনে উঁকি দিয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবের দৃঢ় আবরণ ভেদ করে যে মুখটি বেরিয়ে আসে তা এক সন্তানবৎসল নিরুপায় পিতার। এই দুঃখের দিনে মার্ক্সের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তাঁর স্ত্রী। এই মহীয়সী নারী তাঁর মহান স্বামীকে পারিবারিক তুচ্ছতা থেকে সব সময়েই দূরে রাখতে চেয়েছেন—আর বন্ধুরা যখন দূরে সরে গেছে বন্ধুর মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে তিনি স্বামীকে ঢেকে রেখেছেন—তাঁর মুখে আমরা শুনতে পাই: "এ দুঃখেই আমার বুক ভেঙ্গে যায় যে পারিবারিক যন্ত্রণায় আমার স্বামীকেও জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। অনেককেই তিনি সাহায্য করেছেন কিন্তু আজ তাঁকে সাহায্য করবার কেউ নেই। তাঁর একটা কথা শুনবার জন্যে যারা ভীড় করত—তারা কেউ তাঁর কাগজটাকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখলনা।" মার্ক্স তাঁর পূর্বতন সহকর্মীদের আক্রমণ হাসিমুখে সয়ে যেতে পারতেন কিন্তু পাছে সে সব কথা তাঁর স্ত্রীর কানে যায় সেই ছিল তাঁর দুঃখ।

'ঘরে একটিও ভালো আসবাব নেই, ভাঙা ছেড়া ধূলোভরা যত জিনিষ। পাণ্ডুলিপি, বই, খবরের কাগজের গাদা, ছেলেদের খেলনার পাশে জড় হয়ে আছে—তারি সঙ্গে মার্ক্সের স্ত্রীর শেলাইয়ের যতকিছু সরঞ্জাম। কাণাভাঙ্গা কাপ, ময়লা চামচে, ছুরি কাঁটা, ল্যাম্প, দোয়াত, টাম্‌লার, পাইপ, তামাকের ছাই স্তূপ হয়ে আছে একটা টেবিলের ওপর। ঘরে ঢুকলেই কয়লার আর তামাকের ধোঁয়ায় চোখে তোমার জল আসবেই—আর মনে হবে একটা গুহায় গিয়ে ঢুকেছ। ঘরে ঢুকে বসতে যাওয়া এক সাংঘাতিক ব্যাপার—যে চেয়ারটা খালি সেটা তেপায়া—যেটা আস্ত আছে, ওটার উপর ছেলে-মেয়েরা ঘরকন্নার

খেলা খেলছে। বসতে হলে ওটার উপরই খানিকটা জায়গা করে বসতে হবে আর তাতে তোমার জামা কাপড় নষ্ট হবেই। কিন্তু এসব ব্যাপারে ওঁরা স্বামীস্ত্রী একেবারে উদাসীন। এর মধ্যেই ওঁরা অতিথি-অভ্যাগতদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।'

একজন প্রুশিয়ান গুপ্তচরের বর্ণনা থেকে কার্ল মার্ক্সের লণ্ডনবাসের এ ছবিই দেখতে পাওয়া যায়।

মার্ক্সের এই দুর্দিনের ব্যথা একটি লোকের বুকে বড় বেশি লেগেছিল—তিনি এঙ্গেল্‌স্। তাই তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে গিয়ে ব্যবসায়ে গভীর মনোযোগ দিলেন। এ করে যদি মার্ক্সকে কিছু অর্থ সাহায্য করা যায়।

এত দৈন্য, এত অশান্তি নিয়েও মার্ক্স এক মুহূর্তের জন্যে ভেঙে এলিয়ে পড়েন নি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে রীতিমত পড়াশুনো করে চললেন তিনি। সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পড়া-শুনোয় তাঁর বিরাম ছিল না। তা করে অবশ্য রুটিকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু রুটির ব্যবস্থা হয় না। শেষটায় এমন অবস্থাই হয়ে উঠল যে সংসার আর কিছুতেই চলতে পারে না। এমন সময় একদিন 'দি নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' তাঁকে সেখানে নিয়মিত লেখার জন্যে একটা অনুরোধ জানালে—অল্প হোক—হোক না প্রবন্ধ পিছু এক সভ্‌রেন—তবু একটা রোজগারের পথ হল মার্ক্সের। কিন্তু মুস্কিল হল ইংরিজি ভাষার উপর ভালো দখল ছিল না তাঁর। তাঁর হয়ে তাই এঙ্গেল্‌স্ জার্মেণীর বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

এ সময় য়ুরোপে প্রতিবিপ্লব চূড়ান্তে উঠেছে। 'কম্যুনিষ্ট লীগের' কাগজপত্র পড়েছে পুলিশের হাতে—পুলিশের সন্দেহে যাঁরা ছিলেন তাঁরা দেশ থেকে পালাচ্ছেন। মার্ক্সের বন্ধু ওয়েডমেয়ার আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বার করবার সঙ্কল্প করলেন। মার্ক্স খুব উৎসাহিত হয়ে লেখাপত্র যোগাড়ে লেগে গেলেন—প্রথম সংখ্যার লেখা ছাড়াও লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার নিয়ে

আরেকটা লেখা তিনি নিজে তৈরী করতে লাগলেন। একই বিষয় নিয়ে ভিক্টর হিউগো আর প্রুধ তাঁর আগে দুখানা পুস্তিকা লিখেছিলেন—সে-দুটি বইএর বিরাট প্রতিপত্তির সামনে সসঙ্কোচে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন মার্ক্সের লেখাটি কিন্তু আজ দেখা যায় ভিক্টর হিউগোর আর প্রুধের রচনা কবেই বিস্মৃতিতে মিশে গেছে আর অম্লান জ্যোতিতে দীপ্তি পাচ্ছে মার্ক্সের সে রচনা।

কি নিদারুণ পারিবারিক অসচ্ছলতার মধ্যে থেকে যে মেধার এই ঔৎকর্ষ ঠিকরে পড়েছিল—তা আমাদের কল্পনায়ও আসবেনা। কিন্তু খবর এল ওয়েডমেয়ারের কাগজ 'দি রিভলিউশন' এক সংখ্যা বেরিয়েই টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। 'দি এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব্ লুই বোনাপার্ট' এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে মার্ক্স কিছু টাকার প্রত্যাশা করছিলেন—সে আশা তাঁর নির্মূল হল।

১৮৫২ সন। লণ্ডনের একটি অতি দরিদ্র পরিবার। মৃত্যুর ছায়া নিয়ে এ-পরিবারে এসে উপস্থিত হল ইষ্টার। একবছর বয়সের ছোট মেয়েটির নিউমোনিয়া। ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। তিনদিন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে মেয়েটি মৃত্যুর কোলে শান্তি পেল। রাত্রি নামল—পেছনের ছোট্ট খুপরিতে পড়ে আছে মেয়েটির প্রাণহীন ঠাণ্ডা দেহ। আর, আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা এসে সামনের কোঠায় বিছানা পাতলেন। সমস্ত রাত্রি ধরে চাপা কান্নায় কেঁদে যাচ্ছে সবাই। কাঁদছে কি মেয়েটির বাপও? তাঁর বিপ্লবী চোখের উজ্জ্বলতা কি ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল কান্নার কুয়াশায়? হয়ত নয়—এর চেয়ে আরো বেশি সয়ে যাবার ক্ষমতা আছে তাঁর স্নায়ুতে। চোখ বিস্ফারিত করে রাত্রির অন্ধকারের দিকে হয়ত তিনি তাকিয়ে ছিলেন—সেখানে কি অন্ধকারের পর শুধুই অন্ধকার?—অন্ধকারের শেষে কি জ্বলে উঠবে না কোনো আলো?…ভোর হল। প্রতিবেশিনীর দুয়ারে গিয়ে মা

হাত পাতলেন: কফিনের টাকা নেই। দুটো পাউণ্ড পাওয়া গেল। তাই নিয়ে কবর দেওয়া হল মেয়েটির।

এমন দিনেই ওয়েডমেয়ারের চিঠি এসেছিল দুঃসংবাদ নিয়ে। মার্ক্স শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, নিদারুণ ব্যথার উপর চারদিকের হতাশার চাপে তাঁর স্ত্রীর মন না একেবারে ভেঙে পড়ে।

যে শ্রমিক-মজুরদের মুক্তির চিন্তা মার্ক্স করে এসেছেন, এই পরম দুঃখের দিনে তেমন একজন শ্রমিকের কাছ থেকেই সামান্য একটু আশার আলো এসে উপস্থিত হল। ওয়েডমেয়ার পরের চিঠিতেই জানালেন ফ্রাঙ্কফোর্টের একজন দর্জি আমেরিকায় এসে তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয়—মাত্র চল্লিশটি ডলার—ওয়েডমেয়ারের হাতে তুলে দিয়েছেন কাগজটি চালাবার জন্যে। মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'রিভলিউশন' বেরুল 'দি এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব্ লুই বোনাপার্টি' লেখাটি দিয়ে।

লুই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ধমনীতেই যে শুধু রাজরক্ত ছিল তা নয়—মার মুখে শুনে শুনে তাঁর এমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে তিনি একজন কেউকেটা হবেন। 'সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার' মন্ত্রেই অবশ্য তিনি মানুষ—আর বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে যৌবনে বিপ্লবীও বনে গিয়েছিলেন কিন্তু ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের সতর্কদৃষ্টি তাঁকে অসি ছাড়িয়ে মসী ধরিয়ে দিল। লেখক হিসেবে তিনি নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবাদকেই ফরাসীর পক্ষে আদর্শ বলে দেশবাসীর চোখের উপর তুলে ধরলেন। পরে এই আদর্শে বোনাপার্ট সম্বন্ধে ফরাসীর দুর্বলতার সুযোগ নিতেও তিনি পেছ-পা হননি—এবং বিফল হয়ে কারাবরণও করেছেন। যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থনের উপরই লুই ফিলিপের রাজত্ব নির্ভর করত তাই তিনি কারাজীবনেই হয়ে উঠলেন শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু—যারা বুর্জোয়াদের জাতশত্রু। ফরাসীর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর প্রগতিবাদীদের কাছে লুই বোনাপার্ট বনে গেলেন একজন পীর—

কারণ যখন ফরাসীতে সমাজতান্ত্রিকরা, গণতান্ত্রিকরা আর ক্যাথলিকরা যার যার খুসীমাফিক 'স্বাধীনতা'র ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন 'মৈত্রী'র বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। আর তা-ই হল তাঁর তুরুপের তাস। অনায়াসেই তিনি ফরাসী গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বলে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। কিন্তু সর্বশ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্কদের নির্বাচন ক্ষমতা নিয়ে এসেম্ব্লির মধ্যবিত্ত সভ্যদের সঙ্গে কিছুদিন পরেই তাঁর বিরোধ উপস্থিত হল—শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করে লুই বোনাপার্ট শ্রমিকশ্রেণীকে পেলেন তাঁর দলে। তাঁদের পেছনে পেয়েই তিনি গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করে নিলেন—ঠিক যেমন আসল নেপোলিয়ন প্রথম গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সম্রাট হয়ে বসেছিলেন (ইতিহাসে যার নাম এইটিন্থ ব্রুমেয়ার)। লুই বোনাপার্টের একনায়কত্ব ক্রমে সম্রাটত্বে পরিণত হল—চাষীমজুর, পুঁজিপতি, ধনী, প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লবী, নাস্তিক, আস্তিক সবাইকে তিনি মধুর বচনে তুষ্ট করতে লাগলেন—আর তার ফলও মিলল হাতে হাতে—তাঁকে সম্রাট বলে মেনে নিতে কেউ আপত্তি করলে না। তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন—'শ্রমিকের সম্রাট' বলে। উপাধি নিলেন 'তৃতীয় নেপোলিয়ান'।

এ ঘটনাটিকে ভিক্টর হিউগো ভেবেছিলেন, 'বিনা মেঘে একটি বজ্রপাতের মত—ব্যক্তিবিশেষের হিংস্রতা বলে'। প্রুধঁ একে বিশ্লেষণ করেছিলেন সাধারণ ঐতিহাসিকের মত ঘটনার যোগাযোগ দিয়ে। মার্ক্স এতে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন একটি শ্রেণীদ্বন্দ্বের ছবি ফুটিয়ে তুললেন। তিনি দেখালেন, কি করে ফরাসীতে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এমন অবস্থার উদ্ভব করল যাতে একজন অতি সাধারণ ব্যক্তিও সবার চোখে হয়ে উঠল 'হিরো'। যেদিন মার্ক্স স্বচ্ছদৃষ্টিতে ফরাসীতে এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচিত্র পরিণতি বিচার করেছিলেন, সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তাঁর এ বিচার প্রয়োগ করা যাবে তাঁরই দেশে—১৯৩৩ সনে হিটলারের অভ্যুত্থানের ঘটনায়।

আমরা জানি, দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশি নষ্ট করে। কিন্তু মার্ক্সকে

দেখা যায় দারিদ্র্যের সহস্র লাঞ্ছনায়ও তাঁর মেধার একটু ব্যতিক্রম হয় নি—আদর্শ থেকে একবিন্দু তিনি ভ্রষ্ট হননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ ছিল তাঁর সব সময়েই সোচ্চার—লুই বোনাপার্টের কাজের তীব্র সমালোচনা করতে যেমন তাঁর একটুও বাধেনি তেমনি 'কলোন কম্যুনিষ্ট বিচার' সম্বন্ধে ফরাসী ও জার্মাণ সরকারের বিরুদ্ধে কলম চালাতে তিনি একটুও ইতস্তত করেন নি। অথচ সেই মিথ্যা-মামলার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা রচনার কাগজ যোগাড় করতে তাঁর শেষ কোটটিকেও বন্ধকে পাঠাতে হয়েছিল। পুলিশের বিরুদ্ধে দলিলপত্র যোগাড় করে একটি প্রতিবাদ তৈরী করতে অপর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে মার্ক্সকে। তাঁর ছোট বাড়িটাই তখন একটা অফিসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল—কেউ ব্যস্ত পয়সা যোগাড় করতে, খুঁটে খুঁটে সংবাদ এনে পৌঁচোচ্ছে কেউ—আর দু'তিন জন দিনরাত লিখে যাচ্ছে। কপি করতে করতে মার্ক্সের স্ত্রীর আঙ্গুলে ব্যথা হয়ে গেল—তবু তাঁর নিস্তার নেই। তবে আশার কথা এই যে পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল—সাজানো মামলার ফাঁকি ধরা পড়তে বাকি রইল না। আর ক্ষতির ঘরে দেখা গেল এই গোলমাল য়ুরোপের 'কম্যুনিষ্ট লীগে'র অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছে।

এ ব্যাপারের পর জার্মেণীর সঙ্গেও সম্পর্ক চুকে গেল মার্ক্সের। লণ্ডনে তাঁর মাথা গুঁজবার ঠাঁই ছিল কিন্তু লণ্ডনও তাঁকে যথার্থত গ্রহণ করেনি। প্রতিভার শ্রদ্ধাই শ্রেণীসমাজে বিরল। বিপ্লবী প্রতিভার ত কথাই নেই। উনিশ শতকীয় প্রতিভাবান লোকদের মধ্যে মার্ক্সের দুর্ভোগ আর কাউকে ভুগতে হয়নি—হয়ত তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ছিলেন বলেই এত কঠোর শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছে। কোনো দেশ, কোনো জাতি তাঁর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সন্তানকে এত দীর্ঘদিন নির্বাসন ভোগ করায়নি—মার্ক্সের বেলায় জার্মেণী যা করেছে। সামান্য একটু আপোষ মীমাংসার পথ ধরলে অবশ্যি মার্ক্স তখনকার সমাজে অসামান্য প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারতেন কিন্তু তাঁর আধুনিক শিষ্যদের মত তিনি সুবিধাবাদের জীবনে প্রবেশ করতে দেননি। "দুঃখবিপদের মধ্য

দিয়েও আমি আমার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুব—বুর্জোয়া সমাজের হাতে আমি টাকা তৈরীর যন্ত্র হব না—” এ উক্তি মার্ক্স বক্তৃতা মঞ্চের জন্য তৈরী করেন নি—এ ছিল তাঁর জীবন-ধর্মেরই ভাষা। কিন্তু তা বলে যে নিজের জীবনের দুঃস্থতাকে তিনি উপলব্ধি করেন নি তা নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় সেই ইস্পাতী-মানুষটার ভেতর দিয়ে একটি রক্তমাংসের মানুষ উঁকি দিচ্ছে—তাঁকে বলতে শুনি—পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি একবার বলছেন ঃ “অর্দ্ধ শতাব্দী চলে গেল—তবু আমি যে ভিখিরি সেই ভিখিরি!” ছেলেপিলেদের ভীষণ ভালোবাসতেন তিনি—পড়ার ফাঁকে ওদের সঙ্গে খেলতেও বসে যেতেন, ওদের কাছে ডাক নাম ছিল তাঁর ‘মূর’—তাঁর সেমিটিক কালো চুল আর ময়লা রং-এর দরুণই ছেলেমেয়েরা তাঁকে এ উপাধিটা দিয়েছিল। রবিবার দিনটা সম্পূর্ণ ছিল তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে—তিনি তাদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে বেরুতেন। তাঁর একমাত্র ছেলে ন বছর বয়সে যখন মারা গেল—সে-শোক তিনি সহজে ভুলতে পারলেন না—বহুদিন পর্যন্ত তাঁর বন্ধুদের তাঁকে সান্ত্বনার চিঠি লিখতে হয়েছিল।

সমস্ত দুঃখদৈন্য, রোগশোক, অপমান হতাশার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা ছিল তাঁর এঙ্গেল্‌সের বন্ধুত্ব। এ বন্ধুত্বের তুলনা মানুষের ইতিহাসে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই! চিন্তার স্বচ্ছতায় বা লেখবার ক্ষমতায় এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্সের চেয়ে খুব খাটো ছিলেন না—বিপ্লবের আগুনও বিন্দু-মাত্র ম্লান ছিল না এঙ্গেল্‌সের কপালে—তবু এঙ্গেল্‌স্ তাঁর এদিকটাকে রুদ্ধ করে মার্ক্সকে বাঁচিয়ে রাখতেই আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নিজেকে অর্থোপার্জনে লিপ্ত রেখে অকাতরে তিনি মার্ক্সকে অর্থসাহায্য করে গেছেন—যে-সমাজকে তিনি ঘৃণা করতেন, সেই সমাজেরই একজন হয়ে তিনি অর্থ-উপার্জন করেছেন, অর্থ-উপার্জন করেছেন মার্ক্সকে সাহায্য করতে পারবেন বলেই। যখনই উপোস করে থাকবার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন মার্ক্স—আর তা একবার দুবার নয়—তখনই এঙ্গেল্‌স্

উদ্বিগ্ন মায়ের মত আশঙ্কাতুর মন নিয়ে ছুটে এসেছেন মার্ক্সের কাছে, মার্ক্সের অভাব দূর না করে কর্মস্থলে ফিরে যান নি।

অভাবের দরুণ অস্বাস্থ্যকর জায়গায় ছোট একটা বাড়িতে থাকতেন মার্ক্স, পরিবারের সবাই তাই একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল—মার্ক্স নিজেও যকৃতের রোগে ভুগতে সুরু করলেন। এ সময়ে তাঁর শাশুড়ী মারা যান—তাঁর কিছু টাকা মার্ক্সের হাতে এসে পড়ে। তার উপর ভরসা করে তিনি বাড়ি-বদল করলেন—ভালো বাড়ি হল না, তবু আগের বাড়ির তুলনায় ওটা স্বর্গই ছিল। দিনের বেলায় মার্ক্স পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় ফিরতেন—আর রাত্রিতে বসে বসে রাষ্ট্রিক অর্থনীতির উপর বই লিখতেন—তাছাড়া মিউজিয়ামে গিয়ে বিজ্ঞান-বিষয়ে পড়াশুনো ত ছিলই। বইটা শেষ করে মার্ক্স এঙ্গেল্‌সকে লিখেছিলেন: "এত টাকার অভাব নিয়ে কেউ বোধ হয় টাকা সম্বন্ধে কোনো বই লিখে যান নি।"

'এ ক্রিটিক্ অব্ পোলিটিক্যাল একোনমি'—বইটি বেরুল। এড্যাম্ স্মিথ্ বা ডেভিড্ রিকার্ডোর অর্থনৈতিক মতবাদকে বহু পেছনে ফেলে মার্ক্স এগিয়ে চলে গেলেন—বা এও বলা যায় যে স্মিথ-রিকার্ডোর চেয়ে তাঁর দৃষ্টি অনেক গভীরে চলে গেল। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বলে থাকেন—সমাজ-ভোগ্য বস্তু উৎপাদন করবার একটা শাশ্বত স্বাভাবিক রূপকেই বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী বলা যায়। মার্ক্স বললেন যে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালীতে শাশ্বতের বাষ্পও নেই—এটা সমাজ-ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন প্রণালীর একটা ঐতিহাসিক রূপ—বহু রূপান্তর হতে হতে এখন এই উৎপাদন প্রণালী বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালীর রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্ক্সের এই বইটি খুব ভালো অভ্যর্থনা পায়নি—এমন কি তাঁর ভক্তের দলও এতে কোনো নূতন তথ্য খুঁজে পেলেন না—একমাত্র এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন: টাকা সম্বন্ধে মার্ক্সই প্রথম একটা নিখুঁত সিদ্ধান্ত করলেন।

তখন ইতালী ও জার্মেণীতে শিল্প-বিপ্লব চলেছে। লুই বোনাপার্টের

দ্বিতীয়বার সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ ভেবেছিলেন এবার বুঝি সমস্ত য়ুরোপ বিপ্লবের ভূমিকম্পে নড়ে উঠবে। কিন্তু তাঁদের আশা আশাই রয়ে গেল। নড়ে উঠল অবশ্যি ইতালি আর জার্মেণী—কিন্তু তা স্বাদেশিকতার আন্দোলনে। ইতালি চাইল বিদেশীর প্রভুত্ব উচ্ছেদ করতে—জার্মেণী চাইল্ ইংল্যাণ্ডের উদাহরণে শ্রমিক-ধনিক মিলে একটি শান্তিপূর্ণ জার্মাণ-রাষ্ট্র গঠন করতে।

শ্রমিক-শ্রেণীর আদর্শ নিয়ে একটি ছোট কাগজ চলত, 'ডাস্ ভোক্' তার নাম। ক্রমে মার্ক্স কাগজটার সঙ্গে এমনি জড়িত হয়ে পড়লেন যে শেষটায় ওটার ছাপাখরচ বাবদ কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে মার্ক্সকে রেহাই পেতে হয়। নিজের অর্থ সঙ্কটের মধ্যে সে-টাকাটা ওমনি খরচ হয়ে যাওয়ায় যতটা কষ্টে তাঁকে পড়তে হয়েছিল—তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভোগ 'ডাস্ ভোক্'-এর সূত্রে তাঁকে ভুগতে হয়েছে। ভোগ্‌ট নামে একজন ভ্রান্ত জড়বাদী 'ডাস্ ভোক্'-এ প্রকাশিত একটি বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রতিবাদে শ্রমিকদের প্রতি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন : লণ্ডনের নির্বাসিতদের পাণ্ডা কার্ল মার্ক্স জার্মাণ-শ্রমিকদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করে তাদের ডুবিয়ে ছাড়বেন। এই মিথ্যা অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে যখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মার্ক্স ভোগ্‌ট-এর বিরুদ্ধে দলিলপত্র যোগাড় করছেন তখন মার্ক্সেরই অন্যতম বন্ধু ফ্রেইলিগ্রাথ্ 'শিলার-বার্ষিকী' উপলক্ষে ভোগ্‌ট-এর দলে যোগ দিয়ে সেই উৎসবে একটি কবিতা পাঠ করে এলেন। তাতে ফ্রেইলিগ্রাথের সঙ্গেও মার্ক্সের মনোমালিন্য হয়ে গেল। ভোগ্‌ট-এর দল কাগজে ফ্রেইলিগ্রাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সুরু করে দিলে আর তার সঙ্গে মার্ক্সকে করতে লাগল কঠোর ভাষায় আক্রমণ। একটি বই লিখে ভোগ্‌ট বললে যে মার্ক্সের পেশা-ই হুম্‌কি দিয়ে টাকা উপার্জন করা। নিয়ে জার্মেণীতে সাড়া পড়ে গেল। ভোগ্‌ট-এর আক্রমণের জবাব বইটি দেবার আগে মার্ক্স তাঁর বন্ধু ফ্রেইলিগ্রাথের সঙ্গে আপোষ

মীমাংসা করতে চাইলেন। যারা মার্ক্সকে 'দৃঢ়তায় হৃদয়হীন' বলে জানে —তাদের কাছে ফ্রেইলিগ্রাথকে লেখা মার্ক্সের চিঠির এ ছত্রটি অদ্ভুতই মনে হবে: "তোমাকে যদি কোনোরকমে ব্যথা দিয়ে থাকি—তার ক্ষতিপূরণ করতে পারলে আমি সুখীই হব। মানুষের পক্ষে যা করা উচিত তাই আমি করতে পারি।"

১৯২ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য বেরুল মার্ক্সের কলম থেকে—নাম তার 'হের ভোগ্‌ট'। ধ্রুপদী আর আধুনিক এই দু'শ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্গে যে মার্ক্সের কি গভীর পরিচয় ছিল—ভোগ্‌টের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বাণগুলো থেকেই তা বোঝা যায়। মার্ক্স সোজাসুজি প্রমাণ দিলেন ভোগ্‌ট বোনাপার্টের দলের লোক—তার প্রচারের মূলে আছে বোনাপার্টের টাকা। এই ধরণের বই লেখা অবশ্যি মার্ক্সের মেধার উপযুক্ত নয়—একটা জঘন্য হীনতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় যথেষ্ট অপচয় করেছেন বলা যেতে পারে। কিন্তু তেমনি আবার অন্যায়কে সয়ে যাওয়াও বিপ্লবীর ধর্ম নয়—তাছাড়া এ-বইয়ের মারফৎ তাঁর অনেক নূতন বন্ধু জুটে গেল—আর শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে আবার তাঁর সম্পর্ক নূতন করে স্থাপিত হল।

ভোগ্‌ট-এর আক্রমণ সব চেয়ে বেশী আঘাত করল মার্ক্সের স্ত্রীকে। তিনি অনেক রাত্রিই ঘুমুতে পারেন নি। এতে তাঁর দুর্বল শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগশয্যায় থেকেও তাঁর মার্ক্সের জন্য দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, কারণ মার্ক্স তাঁর কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও উঠে যেতেন না। যাক্, কোন রকমে বিপদ পার হয়ে গেল—তিনি সেরে উঠলেন। এবার শয্যাশায়ী হলেন মার্ক্স—তাঁর পুরোণো যকৃতের যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠল। শুধু তা-ই নয়, তাঁর চিরসঙ্গী অর্থাভাব দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িতে পাওনাদারদের আনাগোনা চলতে লাগল অনবরত। মার্ক্স স্থির করলেন এবারে তিনি হল্যাণ্ডে যাবেন—তাঁর এক কাকা থাকতেন ওখানে।

তখন উইলিয়ম প্রুশিয়ার রাজা হয়ে বসেছেন—তাঁর সিংহাসন লাভের ফলস্বরূপ প্রুশিয়ার রাজবন্দীদের মুক্তি হল—নির্বাসিতরা দেশে ফিরবার অনুমতি পেলেন। মার্ক্স হল্যাণ্ড থেকে বার্লিনে এলেন। তাঁর সঙ্কল্প ছিল, বার্লিনে একটা কাগজ চালাবার ব্যবস্থা করে যাবেন। অপরিসীম সৌহার্দ্যে প্রগতিশীল শ্রমিক-সুহৃদ ল্যাসেল তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু মার্ক্স দেখলেন বার্লিনের চেহারা বদলে গেছে—উদ্ধত আর ফাঁপা মানুষে ভর্তি সহরটা। ল্যাসেল সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ভালো হল না—কাজেই ল্যাসেল যখন মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌-ল্যাসেল এই ত্রয়ীর সম্পাদনায় একটি কাগজ চালাবার সঙ্কল্প জানালেন, মার্ক্স তখনকার মত তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ করলেন না। এ সময়ে ল্যাসেল মার্ক্সকে প্রুশিয়ার নাগরিকত্বে ফিরিয়ে আনবার জন্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রুশিয়ার মত রাষ্ট্র মার্ক্সের মত লোককে ঠাঁই করে দিতে পারে না। মার্ক্স লণ্ডনে ফিরে যাবার পথে কলোনে তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী মার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তাঁর এই সফর একেবারে ব্যর্থ হল না—ভিয়েনার একটি কাগজের সঙ্গে প্রবন্ধ পেছু এক পাউণ্ড পাবার চুক্তি করে নিয়ে তিনি লণ্ডনে ফিরলেন।

'দি নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' ত আছেই তাছাড়া ভিয়েনার এ কাগজটি—লণ্ডনে এসে মার্ক্স ভেবে নিয়েছিলেন অর্থসঙ্কটের খানিকটা নিরসনই বুঝিবা হল। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল, ভিয়েনার কাগজটা তাঁর অনেক প্রবন্ধই ফেলে রাখে, ছাপেনা—আর নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ গেছে চুকে—কেননা তখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে।

এবার আর কোনোদিকে কূল দেখতে পেলেন না মার্ক্স—জীবনে যা তিনি কোনোদিন করেননি দুরন্ত অভাবে তাঁকে তাই করতে হল। রেলওয়েতে একটা চাকুরীর জন্যে মার্ক্স আবেদন করলেন। দারিদ্র্যের কী অমানুষিক পীড়ন যে তাঁর আজীবনের দৃঢ়তাকে এমনি ভাবে টলিয়ে দিয়েছিল আমরা তা সহজেই ভেবে নিতে পারি। তবে ধন্যবাদ তাঁর

বিশ্রী হস্তাক্ষরকে যার দরুণ চাকুরী গ্রহণ করবার অপমান থেকে তিনি রেহাই পেলেন। এই মর্মান্তিক অর্থাভাবের মধ্যে বারবার অসুখে পড়তে লাগলেন মার্ক্স—তাঁর স্ত্রীর রুগ্ন শরীরও আবার ভেঙে পড়বার উপক্রম করল। জুতো কাপড়ের অভাবে মেয়েগুলোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। এই অভাব বুঝবার মত বয়েস হয়েছিল বড় মেয়েটির—সে বাপ-মাকে না জানিয়ে নাটকে অভিনেত্রী হয়ে ঢুকবার চেষ্টা করতে লাগল।

কোনো কোনো সময় হয়ত ভাবতেন মার্ক্স, আসবাবপত্র রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন তাঁরা—দেউলে নামই হয়ত লিখাবেন শেষটায়। ভাবতেন, বড় মেয়ে দুজনকে আয়ার চাকরিতে দিয়ে—স্বামীস্ত্রীতে তাঁরা ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বস্তিতে গিয়ে থাকবেন। এমনি একটা পরিকল্পনা মাফিক কাজও হয়ত তিনি করে বসতেন যদি তাঁর উত্তপ্ত জীবনে এঙ্গেল্‌সের ছায়া এসে না পড়ত।

এঙ্গেল্‌সের বন্ধুত্ব এবারও মার্ক্সকে এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করলে। বাপের মৃত্যুর পর এঙ্গেল্‌স্ তখন কোম্পানীর একজন অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। যদিও আমেরিকার যুদ্ধের দরুণ ব্যবসা ভালো চলছিল না তবু হয়ত তিনি মার্ক্সকে সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু প্রেমাস্পদার মৃত্যুতে এঙ্গেল্‌সের মানসিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। তবু শোকের সেই গভীর আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠে এঙ্গেল্‌স্ দেখতে পেলেন অসহায় মার্ক্সের করুণ ছবি। কোনো রকমে একশো পাউণ্ড যোগাড় করে তিনি বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন।

অভাবে অঁনটনে কেটে গেল একটা বছর। মার্ক্সের মা মারা গেলেন। ছেলের জন্য তেমন কিছু রেখে যাবার অবস্থা হয়ত মার ছিল না। একটানা অভাবই চলতে লাগল মার্ক্সের। পরের বছর মার্ক্সের বন্ধু উইলহেলম্ উল্‌ফ্ মরবার সময় তাঁর আট-ন'শ পাউণ্ড দান করে গেলেন মার্ক্সকে। এই মহৎ দানের যে মহত্তর প্রতিদান দিয়েছিলেন মার্ক্স—আজ তা আমরা বুঝতে পারি। তাঁর অমর গ্রন্থ 'ডাস্

ক্যাপিটেল' উৎসর্গ করেছিলেন তিনি তাঁর এই 'অবিস্মরণীয় বন্ধুকে'ই।

পরের বছর মারা গেলেন ল্যাসেল—অর্থনীতিতে মার্ক্সের সঙ্গে যতই পার্থক্য তাঁর থাক—অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে মার্ক্সের চেয়ে যতই খাটো থাকুক না কেন তিনি, বিপ্লবী হিসেবে মার্ক্স থেকে তিনি একটুও ন্যূন ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু যে মার্ক্সের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল, মার্ক্সের চিঠির এই একটি কথা থেকেই তা বোঝা যায়ঃ "তিনি ছিলেন পুরোণো বিপ্লবী—এবং আমাদের শত্রুদের শত্রু।"

ল্যাসেলের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরেই ১৮৬৪-র ২৮শে সেপ্টেম্বর এক বিরাট জনসভায় লণ্ডনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। শ্রমিকের সুস্পষ্ট দাবী নিয়ে য়ুরোপে তখন পর্যন্ত কোনো আন্দোলন সার্থক হতে পারেনি। ইতালি বা জার্মেণীতে স্বাদেশিকতার আন্দোলনেই শ্রমিকেরা বরাবর যোগ দিয়েছে—ইংল্যাণ্ডে বা ফরাসীতে শ্রমিকেরা যৎসামান্য রাষ্ট্রিক সুবিধা পেয়েই নীরব হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমেই শ্রমিক নেতারা বুঝতে পারছিলেন, এ পথে শ্রমিকের মুক্তি নেই। তাছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রের প্রসার এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের প্রতিপত্তি খর্ব করে ইংল্যাণ্ডের মজুরদের অবস্থাও দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলল—আদর্শবাদী সমাজতান্ত্রিক রবার্ট আওয়েনের বিধি-ব্যবস্থাতেও তখন দেখা গেল মজুরদের বেঁচে থাকবার আর উপায় নেই। ফরাসীতেও শ্রমিকরা সামাজিক সংস্কার দাবী করে বসল—তারা এতদিনে বুঝতে পারল অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ ষোল আনা বজায় রেখে চলতে গেলে নিজেদের আর স্বার্থরক্ষা হয় না। শ্রমিকদের এই আত্মসচেতনতার ফলেই লণ্ডনে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর জন্ম হয়। বহু বৎসর আগে 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'-তে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ যে ঘোষণা দিয়েছিলেন—'দুনিয়ার মজুর এক হও'—তা-ই যেন এতদিনে য়ুরোপের শ্রমিক নেতারা উপলব্ধি করতে পারলেন। সমস্ত দেশের শ্রমিক-প্রতিনিধি এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতা দিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিকের একটি সমিতি গঠিত

হল—সংবাদপত্রের রিপোর্টে জার্মাণ-শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে সব শেষে উল্লেখ করা হল কার্ল মার্ক্সের নাম।

ইংল্যাণ্ড-ফরাসী, জার্মেণী-ইতালী, পোল্যাণ্ড-সুইজার্ল্যাণ্ড-এর শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবেন বলেই মার্ক্স এই সঙ্ঘে যোগদান করেন। কিন্তু অসুস্থতার দরুণই সঙ্ঘের গোড়ার দিককার সভাসমিতিগুলোতে মার্ক্স উপস্থিত থাকতে পারতেন না। ইতালির বিপ্লবী ম্যাজিনিই তখন এ সঙ্ঘে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিলেন। ম্যাজিনির শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না, শ্রেণীদ্বন্দ্বকে বরং তিনি ঘৃণাই করতেন—পুরোণো পরিত্যক্ত কতকগুলো সমাজতান্ত্রিক বুলি দিয়ে তিনি একটা প্রোগ্রাম তৈরী করলেন। ওটাকে বাতিল করে দিয়ে মার্ক্স ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর ইতিহাস দিয়ে শ্রমিকদের জন্য একটা অভিভাষণ দাঁড় করালেন। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ও কর্তব্য বর্ণনা করে মার্ক্স তাতে বললেন যে শ্রমিকের মুক্তি একটা স্থানীয় বা জাতীয় ব্যাপার নয়—এ একটা সামাজিক ব্যাপার। আধুনিক সমাজ যে যে দেশে বর্তমান, সে সমস্ত দেশকে জড়িয়েই এ-কাজ করতে হবে এবং যখন সুসংবদ্ধ সহযোগিতায় এসব দেশ এ-কাজ করতে থাকবে তখনই কেবল সুফল পাবার সম্ভাবনা আছে।

জার্মেণীর শ্রমিক-আন্দোলনের গতি-নির্ণয় করছে তখন ল্যাসেলের দল। শ্রমিক-স্বার্থ বুঝতে পারলেও তারা প্রুশিয়ার রাষ্ট্রিক স্বার্থকে ভুলতে পারছিল না—এ ব্যাপারে তারা অনেকটা বিসমার্কের খর্পরেই গিয়ে পড়েছিল। তাদের কাগজ 'সোশ্যাল ডেমোক্রেট' ক্রমাগত যে ল্যাসেল-বাদ প্রচার করে চলেছিল তা অনেকটা বিসমার্কের কর্মপদ্ধতিরই অনুকূল। কাজেই মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ এদের সঙ্গে সম্পর্ক না চুকিয়ে থাকতে পারলেন না।

'আন্তর্জাতিক' থেকে জার্মেণীর ল্যাসেলীয় দল বাদ পড়ল—তার কাজ চলতে লাগল ইংল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন দলের লোকদের ভেতর

আর ফরাসী প্রুধঁবাদীদের নিয়ে। বারবার অসুস্থতার যন্ত্রণার উপর বই লিখবার তাড়না নিয়ে মার্ক্স অসাধারণ পরিশ্রম করে চললেন আন্তর্জাতিকের কাজে। সঙ্ঘের কাজ করবার মত এমন অসাধারণ ক্ষমতা তখন আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না। মার্ক্সের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার পরিচয় দেবার যথেষ্ট সুযোগও হল এখন। তারই পরিশ্রমের ফলে আন্তর্জাতিকের ইংরেজ সমর্থকরা আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলোর বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডকে যোগদান করতে বাধা দিলেন। ইংরেজ-শ্রমিকরা এব্রাহাম লিঙ্কনকে যে অভিনন্দন জানালে তার রচয়িতা ছিলেন মার্ক্স। নিগ্রোদের দাসত্বের অবসান করেছেন বলে লিঙ্কনের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল মার্ক্সের।

১৮৬৫-তে লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল—ইংল্যাণ্ড, জার্মেণী, ফরাসী, বেলজিয়াম, সুইজার্ল্যাণ্ডের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে। এতে যে কর্মপ্রণালীর খসড়া তৈরী হল তাতে শুধু শ্রমিকদের স্বার্থের কথাই ছিল না, ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও আন্তর্জাতিকের কর্তব্যের একটি অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছিল। তাছাড়া শ্রমিকসঙ্ঘের বৈদেশিকনীতিতে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার কথা-ও অন্তর্ভুক্ত হল। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা মার্ক্সের চিন্তা বরাবরই আচ্ছন্ন করে ছিল, তাঁরই চেষ্টায় লণ্ডনের সম্মেলন এ প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করে।

মার্ক্স যখন এই বিরাট আন্দোলনে মগ্ন—সামান্য ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করবার মত টাকাও কিন্তু তখন তাঁর ছিল না। শুধু এঙ্গেল্‌সের সাহায্যই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। এমন সময় মার্ক্সের কাছে টাকা রোজগারের একটা প্রস্তাব এসে উপস্থিত হয়—প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপরিচিত লোথার বুচার, যিনি তখন প্রুশীয় সরকারের উঁচু ধাপে বিচরণ করতেন। বুচার মার্ক্সকে প্রতি মাসে আর্থিকজগতের আন্দোলন সম্বন্ধে একটা করে আলোচনা লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। এই অনুরোধের পেছনে বিস্‌মার্কের কোনো কারসাজি আছে কি না তা সঠিক জানা না গেলেও মার্ক্স তা রক্ষা

করলেন না। আর্থিক জগত সম্বন্ধেই তিনি তখন রাত জেগে জেগে বই লিখছিলেন কিন্তু তার একটি কথাও বুচারের জন্য নয়—সে তাঁর অমরগ্রন্থ 'ক্যাপিটেল্'। বারবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন কিন্তু রাত জাগার তাঁর বিরাম নেই। ডাক্তাররা এই অত্যধিক পরিশ্রম আর অনিয়ম বন্ধ করতে উপদেশ দিলেন—কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানালেন এঙ্গেল্স্—মার্ক্স সকলের অনুরোধে পড়ে শেষে মার্গেটে গেলেন স্বাস্থ্যের অন্বেষণে। মার্গেটে সত্যিকারের অবসর উপভোগ করতে লাগলেন মার্ক্স। পড়াশুনো নেই—সমস্ত-দিন ঘুরে বেড়ানো, বাড়ি ফিরে রাত দশটায় ঘুম। এ অবস্থাটা বর্ণনা করে মেয়ের কাছে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "বৌদ্ধরা যাকে মানুষের পরম শান্তি বলে বিবেচনা করে সেই নির্বাণের দিকে আমি এগিয়ে চলেছি।"

আন্তর্জাতিকের কাজ খুবই আশাপ্রদ দেখা যাচ্ছিল। লণ্ডনের হাইড পার্কে বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা আর প্যারিসের ট্রাফালগার স্কোয়ারে সঙ্ঘের সভ্য লুক্র্যাফটের অধিনায়কত্বে শ্রমিকদের উত্তেজনা মার্ক্সকে খুসী করে তুলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নের পাণ্ডাদের সমস্ত উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। ট্রেড ইউনিয়নের যা পরিণতি—সংস্কারবাদে আশ্রয় নেওয়া, শ্রমিক আর ধনিকের গা ঘেঁসে থাকা—ইংল্যাণ্ডের আন্দোলনের গতি সে-অবস্থায়ই গিয়ে দাঁড়াল। মার্ক্স এ অবস্থা উপলব্ধি করে আসন্ন জেনেভা-সম্মেলন সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন—তাঁর আশঙ্কা হল সেখানে য়ুরোপের কর্মীরা তাঁদের বিদ্রূপে বিদ্ধ করবেন। জেনেভা-সম্মেলনের তারিখটা পিছিয়ে যাওয়াতে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের দুরবস্থা খানিকটা চাপা পড়ল।

জেনেভা-সম্মেলনে ফরাসী দলেরই জোর বেশি ছিল। এ দলের বেশির ভাগ লোকই ছিল প্রুধোঁর সাক্রেদ। তাদের সম্বন্ধে মার্ক্স অত্যন্ত সত্য অথচ নিষ্ঠুর ধারণা পোষণ করতেন—তিনি বললেন:

"এরা মূর্খ অথচ বিজ্ঞানের বুকনি এদের মুখে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিপ্লবকে এরা গালাগাল দেয়, মানতে চায় না যে সামাজিক আন্দোলন রাষ্ট্রিক উপায় অবলম্বন করে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ববাদের বিরোধিতার ভান নিয়ে এরা বুর্জোয়া অর্থনীতিকেই বরদাস্ত করে যাচ্ছে।" যা-ই হোক, জেনেভা-সম্মেলনে শ্রমিক শ্রেণীর এবং ট্রেড ইউনিয়নের যথার্থ কর্তব্যের একটা খসড়া তৈরী হল—প্রস্তাব করা হল, সঙ্কীর্ণতার বা স্বার্থপরতার ঠাঁই এখানে নেই, এখন থেকে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই সম্মিলিত চেষ্টা হবে পদদলিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মুক্তির উপায় করা।

এ সময়ে আন্তর্জাতিকের কাজের চেয়ে ঢের বড় সৃষ্টি নিয়ে মার্ক্স আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন—তিনি জড় করে চলছিলেন এমন একটি সৃষ্টির উপাদান যার মূল্য শ্রমিকদের কাছে চিরন্তন। বহু বিনিদ্ররজনী, বহু দৈহিক পীড়া, মানসিক অশান্তি, পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য, অর্থাভাব আর পরিশ্রমের পর ১৮৬৪-র শেষাশেষি তিনি 'ক্যাপিটেল'এর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা শেষ করলেন। ১৮৬৫-র মার্চে পরিণত আকারে 'ক্যাপিটেল'-এর প্রথম খণ্ড লেখা হল। পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ আগেই হামবুর্গে প্রকাশকের কাছে চলে গিয়েছিল—দ্বিতীয় অংশ সঙ্গে নিয়ে ১৮৬৭-র এপ্রিলে তিনি নিজে হামবুর্গে এলেন। যে-বই লিখবার জন্যে মার্ক্স নিজের দিকে ফিরে তাকান নি—স্ত্রী আর সন্তানদের দিকে চোখ বুঁজে ছিলেন, তা নিয়ে তাঁর মনে আশা আর আশঙ্কার সীমা ছিল না। বন্ধু কুগেলম্যানের আমন্ত্রণে তিনি হ্যানোভারে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ রইলেন। জীবনে যা তিনি ভাবেন নি হ্যানোভারে তাই হল। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন হ্যানোভারের বুর্জোয়া সমাজও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি দেখায়। তাছাড়া কুগেলম্যানের পারিবারিক আবহাওয়ায় তিনি এমন একটা সম্প্রীতির স্পর্শ পেলেন যা স্মরণ করে পরবর্তী জীবনে তিনি বলেছিলেন: "জীবনে মরুভূমিতে চলতে চলতে ওক'টা দিন আমি মরূদ্যানে বাস করে এসেছি।"

ক্যাপিটেলের ছাপার কাজ যখন এগিয়ে চলছিল মার্ক্স খুবই আশা করেছিলেন বইটা প্রকাশিত হবার পর তাঁর আর্থিক চিন্তার খানিকটা লাঘব হবে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মত অবস্থা আর বেশি দূরে নেই ভেবেই তিনি এঙ্গেল্‌স্‌কে সাহায্যদানের কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জ্ঞাপন করে ফেলেছিলেন ঃ "তুমি না থাকলে এই বই আমার শেষ হত না। আমার মনের উপর এ চিন্তাটা একটা বোঝার মতই চেপে আছে যে তুমি ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা অপচয় করছ। ক্ষমতার উপর তোমার মর্চে ধরে গেল কেবল আমারি জন্যে। তাছাড়া আমার দুঃখের ভাগী হয়েও তোমাকে কম যন্ত্রণা পেতে হয়নি।"

এ যে শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা নয়, বন্ধুত্বের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন তা এই চিঠির কথাগুলো থেকেই প্রমাণিত হয়। মার্ক্স দান গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছ থেকেই বাইরে-ভেতরে যিনি ছিলেন মার্ক্স থেকে অভিন্ন। যাঁর কাছে মার্ক্স অনায়াসে হাত পেতে দিয়েছেন, তাঁকে তিনি অকপটে শ্রদ্ধেয় মনে করতেন। তাই দেখতে পাই একেক সময় দ্বিতীয় ব্যক্তির দান তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। হ্যানোভারে থাকবার সময়ই বিসমার্ক তাঁকে হাত করে নেবার অভিপ্রায়ে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন তিনি যেন জার্মাণ জাতির কাজে তাঁর বিরাট প্রতিভা নিয়োগ করেন। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে মার্ক্স লণ্ডনে চলে আসেন। জাতীয়তার ফাঁদে পা বাড়ালে অনেকদিন আগেই তাঁর জন্যে সোনার খাঁচা ছিল—নির্বাসিতের জীবন নিয়ে অজস্র দুঃখে তাঁকে আর দিনপাত করতে হত না।

লণ্ডনে আসবার পথে বিস্‌মার্কেরই আত্মীয়া একটি তরুণীর সঙ্গে মার্ক্সের আলাপ হয়। লণ্ডনে নেমে গন্তব্য স্থানের ট্রেনের জন্যে তরুণীটিকে স্টেশনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হত—মার্ক্স সে সময়টা তাকে নিয়ে হাইড পার্কে বেড়িয়ে এলেন। পরে এই অভিজাত তরুণী জানতে পেরেছিল সেদিন যাঁর হাতে সে পড়েছিল তিনি একজন সর্বনেশে সমাজতান্ত্রিক। তার জন্যে অবশ্যি মেয়েটি বেঁকে বসল না—

চিঠিতে মার্ক্সের মত একজন সৎ সহযাত্রীকে অজস্র ধন্যবাদ পাঠিয়ে দিলে।

লণ্ডনে এসে বইটার শেষ প্রুফ দেখে আবার মার্ক্স এঙ্গেল্‌সের বন্ধুত্বকে স্মরণ করলেন: "তোমার ত্যাগ স্বীকার ছাড়া তিন খণ্ডের এই বিপুলায়তন কাজ করা আমার পক্ষে সাধ্য ছিল না। সকৃতজ্ঞ অন্তরের আলিঙ্গন জানাচ্ছি তোমাকে। প্রিয়বন্ধু, আমার প্রীতিসম্ভাষণ নাও।"

বই বেরুল। নিজের পায়ে দাঁড়াবার তেমন কোনো আশা দেখতে পেলেন না মার্ক্স। এমন কি সস্তায় থাকা যাবে বলে মার্ক্স এসময়ে জেনেভাতে যাবার সঙ্কল্পও করেছিলেন। কিন্তু তাহলে তাঁকে আন্তর্জাতিক-কে ছেড়ে দিতে হয়—আর বিচ্ছেদ ঘটে তাঁর 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে'র সঙ্গে। এ ক্ষতি সহ্য করতে তিনি রাজী ছিলেন না। আর তাছাড়া তিনি এমন একজন প্রকাশকের আশায় ছিলেন যে তাঁর বইটির ইংরিজি অনুবাদ বার করবে।

এ সময়ে তাঁর পরিবারে একটি সুখের ঘটনা ঘটে গেল। ডাক্তার লাফার্গের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে লরার বিয়ে হ'ল। লাফার্গ ছিলেন প্রুধঁবাদী, আন্তর্জাতিকের সূত্রে মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এঁর সম্বন্ধে মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্‌কে লিখেছিলেন: "এই তরুণ ছেলেটি আমার ভক্ত হয়ে পড়ল—কিন্তু অল্পদিন পরেই দেখা গেল বাপের চেয়ে মেয়ের দিকেই সে বেশি ঝুঁকে পড়েছে।"

লাফার্গের দেহে তাঁর ঠাকুমার-দেওয়া খানিকটা নিগ্রো রক্ত ছিল—তাই তাঁকে বেশি জেদ করতে দেখলে মার্ক্স কৌতুক করে বলতেন: "নিগ্রো খুলি"। নিগ্রো খুলি-ওয়ালা লাফার্গই মার্ক্সের মননশীলতার উত্তরাধিকার সযত্নে রক্ষা করে গেছেন।

'ক্যাপিটেল'-কে কে কি ভাবে গ্রহণ করে সে নিয়ে বিরাট একটা দুশ্চিন্তা ছিল মার্ক্সের। এঙ্গেল্‌স্‌ বইটির প্রচারের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। মার্ক্সের এই অপূর্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি শত্রুমিত্র সব দল থেকেই সপ্রশংস অভ্যর্থনা লাভ করল। প্রশংসা করলেন শুইট্‌ৎসার, ডিট্‌সেন,

ডুরিং, রুজ, ফয়ারব্যাক্ প্রভৃতি লেখকসমাজ।

'ক্যাপিটেলে'র প্রথম অনুবাদ বেরুল রাশ্যাতে। জার-শাসিত রাশ্যার বিরোধিতা মার্ক্স চিরকালই করে এসেছেন আর ঘটনার এমনি পরিহাস যে সেই রাশ্যাই হল তাঁর পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তী অনুবাদ হল ফরাসী ভাষায়। বরাবরই ইংরিজি অনুবাদের অপেক্ষায় ছিলেন মার্ক্স কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় 'ক্যাপিটেলে'র কোনো ইংরিজি অনুবাদ বেরুল না।

'ক্যাপিটেলে'র প্রথম খণ্ড মাত্র সম্পূর্ণ ভাবে লিখে গিয়েছিলেন মার্ক্স—দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড তাঁর হাতে পরিণতি লাভ করে নি—যে তথ্যগুলো মার্ক্স সংগ্রহ করেছিলেন তা-ই সাজিয়ে গুছিয়ে এঙ্গেল্স্ মার্ক্সের মৃত্যুর পর সে দু'খণ্ড প্রকাশ করেন!

অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'ক্যাপিটেল' যে সত্য বহন করে এনেছে তা যেমনি অভূতপূর্ব, তেমনি বিজ্ঞান-সম্মত। প্রথম খণ্ডে মার্ক্স আলোচনা করেছেন টাকা কি করে মূলধনে রূপান্তরিত হয়, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের আশ্রয়ে কি করে শ্রমিকের উদ্বৃত্তশ্রম ধনিকের পুঁজি তৈরী করে। মার্ক্সের আগে বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিজ্ঞরা বলতেন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ধনিক যে টাকা খরচ করে, টাকা মারা যাবার যে আশঙ্কা থাকে তার দরুণই ধনিক মুনফা পায়—অথবা সুদক্ষ পরিচালনার পুরস্কার স্বরূপই দ্রব্যমূল্যে একটা অঙ্ক যোগ করে দেওয়া হয়।

এ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে অর্থনীতিবিদরা একের স্বচ্ছলতা ও অপরের দারিদ্র্যকে ন্যায়সঙ্গত ও অপরিবর্তনীয় বলে আখ্যা দিয়ে গিয়েছিলেন। আবার আরেকদিকে মার্ক্সের পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক দল পুঁজিবাদীর সম্পত্তিকে বলতেন জুচ্চোরি টাকার মারফৎ শ্রমিকদের প্রাপ্য চুরি করে নেওয়ার ফল। মার্ক্স দেখালেন পুঁজি তৈরী করতে জোর জবরদস্তি বা জুচ্চোরির কথাই উঠে না, পুঁজি সম্বন্ধে পুঁজিবাদীরাও সচেতন নয়—উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য গতিতেই তা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। খানিকটা শ্রমের জন্যে শ্রমিক মূল্য পায় না—সে শ্রমই

টাকায় পরিণত হয়ে পুঁজি তৈরী করে। দ্রব্যের মূল্য ( দ্রব্যতে শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে ) আর শ্রমশক্তির মূল্যতে ( নিজের ভোগ্যবস্তু তৈরী করতে যে পরিমাণ শ্রম শ্রমিককে নিয়োগ করতে হয় ) যে পার্থক্য রচিত হয় তাকেই বলে 'সারপ্লাস ভেলু' বা উদ্বৃত্ত মূল্য : উৎপাদনোপায়ের কর্তা বলে' পুঁজিপতি সেই উদ্বৃত্ত মূল্যকে পকেটস্থ করে ফেঁপে ওঠে।

পুঁজির সত্যিকারের রূপ আবিষ্কার করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে মার্ক্স তার সমাজগত রূপকে বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন। বাজারে, ব্যাঙ্কে, ষ্টক এক্সচেঞ্জএ পুঁজির খেলা কি সূত্রে বর্তমান জগৎকে বেঁধে রেখেছে—কি করে স্বার্থান্বেষী প্রত্যেক পুঁজিপতি যৌথ মুনাফায় চুক্তিবদ্ধ হয়—কি উপায়ে সমাজের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয়ের হাতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্কট আসন্ন করে তোলে তার এমন বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ বিচার মার্ক্সের আগে আর কেউ করেন নি। প্রথম খণ্ড শ্রমিকের জীবনে যে নূতন আলোকপাত করেছিল, দ্বিতীয় বা তৃতীয় খণ্ডে শ্রমিকের জন্যে ততটা আলোক অবশ্যি সঞ্চিত হয়ে নেই কিন্তু তাতে আছে সমাজের স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, নিরাবরণ বৈজ্ঞানিক রূপ।

'আন্তর্জাতিকে'ও ক্রমেই মার্ক্সের প্রতিপত্তি বেড়ে উঠছিল—তার কারণ মার্ক্সের অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। প্রুধঁ-বাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্ক্সের অভিমতের উপরই আন্তর্জাতিকের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল—দেশে দেশে কারখানায় ষ্ট্রাইক সুরু হয়ে গেল পুরোদমে, প্রুধঁবাদীরা তাঁদের নির্বিরোধপন্থা নিয়ে ষ্ট্রাইক বন্ধ করতে পারলেন না। পুলিশের গুলি চলল কেবল মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধতা দৃঢ়তরই করে তুলবার জন্যে। তবে আন্তর্জাতিকের ভেতরকার অবস্থা তত আশাপ্রদ ছিল না।

যে উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক স্থাপিত হয়েছিল—প্রত্যক দেশের মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আত্মসচেতন করে তোলা, শ্রেণীদ্বন্দ্বের দিকে অগ্রসর করে দেওয়া—সে উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত না হলেও—

আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের নীতি ও কর্মপ্রণালী নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ উপস্থিত হতে লাগল। প্রুধঁ-বাদীরা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও রুশ-বিপ্লবী বাকুনিনের কণ্ঠ নীরব হল না। বাকুনিনের বৈপ্লবিক মনের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না,—শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন করেও তিনি সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে উঠতে পারেন নি। রাষ্ট্রের অস্তিত্বই তাঁর কাছে ছিল অসহ্য, কতকগুলো মুক্ত উৎপাদক সঙ্ঘের সমষ্টিতে সমাজ ও দেশ পরিচালিত হবে এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। মার্ক্সের পরিকল্পনা ছিল, রাষ্ট্রনীতি অধিকারের পর শ্রমিক রাষ্ট্র গঠন—যা ক্রমশঃ ক্ষয় হতে হতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। বাকুনিন আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে মার্ক্সের বিরোধিতা করে নৈরাজ্যবাদের চীৎকার তুলতে সুরু করলেন। বাকুনিনকে বলা যায় মুক্তি-পাগল। মার্ক্সের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং চিন্তাশক্তির প্রশংসা করেও বাকুনিন বলতেন যে মুক্তির মর্ম মার্ক্স প্রুধেঁর মত বুঝতে পারেন না। বহুবারই বাকুনিনের সঙ্গে মার্ক্সের মিলন ও বিচ্ছেদ হয়েছে, মার্ক্স বাকুনিনের অবৈজ্ঞানিক মতবাদকে অপছন্দ করলেও তাঁর বিপ্লবী চরিত্রকে শ্রদ্ধা করতেন। বাকুনিনের বিরুদ্ধে মার্ক্সের দলীয় লোকদের অভিযোগ ছিল অজস্র—সে অভিযোগে কান দিলেও মার্ক্স সব সময় তাতে মন দেন নি।

১৮৬৯-৭০-এ আর্থিক কষ্ট থেকে মার্ক্স মুক্তিলাভ করলেন। এঙ্গেল্‌স্ কতকগুলো টাকা নিয়ে তাঁর ব্যবসার অংশ অপর অংশীদারকে দিয়ে চলে এলেন। মার্ক্স ভরসা পেলেন অন্ততঃ পাঁচ-ব'ছরের জন্যে বার্ষিক ৩৫০ পাউণ্ড করে এঙ্গেল্‌স্ থেকে তিনি পেয়ে যাবেন। কার্য্যত শুধু পাঁচ ছ'বছরই নয়—মৃত্যু পর্য্যন্ত মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্ থেকে তাঁর প্রয়োজন মত টাকা পেয়ে গেছেন।

'আন্তর্জাতিক' শ্রমিকসঙ্ঘের সূত্রে বিভিন্ন দেশে যে মৈত্রীর বীজ বপন করতে চাচ্ছিল সে চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে রাজ্যলোভী রাষ্ট্রনায়কদের সংঘর্ষ বেধে গেল। জার্মাণ শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে

'আন্তর্জাতিক' ব্রান্‌স্‌উইক কমিটিতে ফতোয়া পাঠাল : ফরাসী বা জার্মাণ শ্রমিক যুদ্ধ চায় না, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না— পরস্পরের স্বার্থের ঐক্য সন্ধান করবে। কিন্তু এ ফতোয়ায় কোন ফলই হল না—ফ্র্যাঙ্কোজার্মাণ যুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে, বোনাপার্ট বন্দী হয়েছেন—প্যারিসে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্যারিসের পতনের পর ফরাসী একটি 'জাতীয় পরিষদ' গঠন করবার অনুমতি নিয়ে জার্মেণীর সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মেণীকে বহু অর্থ ও আলসেস্ লোরেন ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু প্যারিসবাসীরা এ চুক্তি সমর্থন করল না—যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে তারা প্যারিসে স্বায়ত্ত-শাসন ( 'প্যারিস কম্যুন' ) প্রতিষ্ঠিত করল। শ্রমিক ও প্রগতিবাদী বুর্জোয়াদের সম্মেলনে এই স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার আয়ু ছিল মাত্র তিন মাস। খবর পেয়েই জাতীয় পরিষদের ফৌজ ছুটে এলো প্যারিসের দিকে। প্রায় দু'মাস যুদ্ধের পর বহু রক্তদান করে 'প্যারিস কম্যুনের' মৃত্যু হল।

'প্যারিস কম্যুনে' মার্ক্স অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে 'কম্যুন' 'আন্তর্জাতিকে'রই কীর্তি। এমনিতেই 'আন্তর্জাতিক' বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত যন্ত্রণার মূল বলে অখ্যাতি অর্জন করেছিল, তারপর মার্ক্সের এই ঘোষণার ফল দাঁড়াল ভীষণ। যদিও কম্যুনের রূপটা কম্যুনিষ্ট-ম্যানিফেষ্টো বর্ণিত পথে অগ্রসর হয়নি, গোড়া থেকেই রাষ্ট্রকে বর্জন করে প্রুধঁ বাকুনিনের মতবাদকে সমর্থন করে চলছিল তবু মার্ক্স তাতে নতুন সমাজের গৌরবময় ছবি দেখতে পেলেন, তিনি বললেন : "এ বিপ্লবের শহীদরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রশস্ত হৃদয়ে অমর হয়ে রইলেন।"

কম্যুন-কে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে 'আন্তর্জাতিক' যেন শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেছিল। সমস্তদেশের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো 'আন্তর্জাতিক'কে কটূক্তিতে বিদ্ধ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই শাসক-সম্প্রদায় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল।

ফরাসী আর স্পেন সরকার শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের উচ্ছেদ করবার জন্যে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। যুদ্ধে লিপ্ত থেকে জার্মেণীর শ্রমিক আন্দোলনে শৈথিল্য এসে গিয়েছিল। তার উপর সোশ্যাল ডেমোক্রেট দলের নেতা বেবেল নিজেদের কম্যুন-কারীর দলভুক্ত বলে ঘোষণা করে শ্রমিক আন্দোলনের উপর বিসমার্কের আক্রমণ উদ্যত করে তুললেন। আর 'আন্তর্জাতিকে'র সঙ্গে যুক্ত আইসেনাখের দল ক্রমে জার্মাণ জাতীয়তায় মগ্ন হয়ে গেলো। শেষটায় ইংরেজ শ্রমিকদের সহযোগিতা থেকেও 'আন্তর্জাতিক' ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। মার্ক্সের মুখে কম্যুনের তারিফ শুনে ট্রেড ইউনিয়নের দু'জন পাণ্ডা 'আন্তর্জাতিকে'র পদ ত্যাগ করলেন। অবশ্যি ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ কোনদিনই আন্তর্জাতিক আদর্শের অনুকুল ছিল না—একদিন না একদিন এ-বিচ্ছেদ ঘটতই—প্যারিস কম্যুনের ব্যাপারটা একটা উপলক্ষ হল মাত্র।

সবশেষে গোলমাল উপস্থিত করলেন বাকুনিন্। তাঁরই নৈরাজ্য-বাদী আদর্শের পথে প্যারিস কম্যুনের চেহারাটা তৈরী হয়েছিল বলে তাঁর মতবাদকে সমর্থন করবার একটা দল দাঁড়িয়ে গেল। ইতালি ও স্পেনের শিল্পবিপ্লব যে শ্রমিকশ্রেণী তৈরী করে চলছিল—বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদকেই তারা মুক্তির পথ বলে মনে করে নিলে—তাছাড়া সুইজারল্যাণ্ড ঘড়ির কারিকরদের মধ্যে এবং ফরাসীর প্রুঁধবাদীদের মধ্যেও তাঁর প্রভাব ছিল বিস্তর। তাই বাকুনিনের ব্যক্তিত্বও এসময়ে 'আন্তর্জাতিক' বিলক্ষণ অনুভব করতে সুরু করে। তাতেও হয়ত আন্তর্জাতিকের কর্মপদ্ধতি খুব বেশি ব্যাহত হত না কিন্তু লণ্ডনের 'জেনারেল কাউন্সিল' বা মূল পরিষদের সভ্যদের মধ্যেই আর তখন মতের কোনো রকম মিল ছিল না। শ্রমিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে সবদেশেই শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল—প্রত্যেকটি সঙ্ঘেই স্বাজাত্যের ছোঁওয়া নিবিড় ভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল আর তারই প্রতিধ্বনি মূলপরিষদের সভ্যদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল ব্যক্তিত্ব-

বাদের রূপ নিয়ে। বাকুনিন্ মার্ক্সের মেধা ও কর্মশক্তির প্রশংসা করেও বলতে লাগলেন যে আন্তর্জাতিকের না কি তিনি একনায়ক। মূল পরিষদে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন ভেবে বাকুনিন্‌কে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও এসময়ে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ দলাদলির সংস্পর্শ বাঁচাবার জন্যে মূল পরিষদকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করবারও প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষটায় মূল পরিষদ নিউইয়র্কেই উঠে যায়। এতে আন্তর্জাতিকের অনেক সভ্যই মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের উপর ক্ষেপে উঠলেন —এবং বাকুনিনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁদেরকে একনায়কত্বের দোষে দোষী করতে সুরু করলেন। নিউইয়র্কের পরিষদ জেনেভায় একটি বৈঠক আহ্বান করল ৮ই সেপ্টেম্বর—১৮৭৪ সন। জেনেভাতেই ১লা সেপ্টেম্বর বাকুনিন পাল্টা বৈঠক বসালেন। বাকুনিনের বৈঠকে সর্ব-দেশের প্রতিনিধি যোগদান করলেন কিন্তু মার্ক্সীয় বৈঠকে সুইজারল্যাণ্ড ও জেনেভার লোক ছাড়া আর কেউ এলেন না। আন্তর্জাতিকে মৃত্যুর বীজ ঢুকেছিল—জেনেভার বৈঠকে দেখা গেল সে-বীজ শিকড় চালিয়ে আন্তর্জাতিকের প্রাচীর ধ্বসে দিয়েছে।

আবার মার্ক্স বাইরের জগৎ থেকে পড়ার ঘরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু প্যারিস কম্যুনের পরবর্তী ঘটনার আঘাতগুলো তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিলে। মাথায় যন্ত্রণা হল ভীষণ—ডাক্তাররা আশঙ্কা জানালেন সন্ন্যাস রোগের আক্রমণ হওয়া বিচিত্র নয়। ঔষধপত্রে খানিকটা নিরাময় হয়ে তিনি ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যান্বেষণে য়ুরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। স্বাস্থ্য তিনি নিশ্চয়ই ফিরে পেতেন—যদি বই-এর সঙ্গে সম্পর্কটা তাঁর বন্ধ থাকত। কিন্তু পড়ার তার বিরাম ছিল না, প্রাচীন ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, জমির ইতিহাস, রুশ-আমেরিকার জমিদারি প্রথা নিয়ে তিনি অসাধারণ পড়াশুনো সুরু করে দিলেন।

এ সময়ে জার্মেণীতে ল্যাসেলীয় শ্রমিকদলের সঙ্গে আইসেনাখ

শ্রমিকদলের একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও জার্মেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্সের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হল না। বার্লিনের দরিদ্র ও অন্ধ অধ্যাপক ডুরিং শ্রমিক আন্দোলনের বহু মননশীল লোকের শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন—সেই ডুরিং বিজ্ঞানের আধা জ্ঞান নিয়ে মার্ক্সের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করতে সুরু করলেন। এঙ্গেল্‌স্ তাঁর জবাব দিতে লাগলেন কিন্তু মার্ক্স নিরস্ত থেকে শুধু একথা বললেন : "ল্যাসেলের দলের সঙ্গে যখন আপোষ করতে হয়েছে তখন ডুরিং-এর মত অনেক ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিকের সঙ্গেই আপোষ চালাতে হবে! তাছাড়া আপোষ করতে হবে ছাত্র আর অধ্যাপকদের সঙ্গেও, যারা সমাজতন্ত্রের জড়বাদী ভিত্তিতে আদর্শবাদ এনে ঢুকিয়েছে!" ল্যাসেলের দলের সঙ্গে আপোষ করবার বিরোধী ছিলেন মার্ক্স।

কিন্তু সবদিক থেকেই মার্ক্সের জীবন-সন্ধ্যা অন্ধকার ছিল না। আন্তর্জাতিকে দেখা গেল একটি শুভ-লক্ষণ। দেখা গেল শ্রমিকেরা বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদে আস্থা হারিয়ে মার্ক্সের মতবাদের দিকেই আবার ঝুঁকে পড়ছে। তাছাড়া জার্মেণীতে বিসমার্ক-প্রবর্তিত সমাজ-তান্ত্রিকবিরোধী আইন একটা বাঞ্ছিত ঝড়ের কাজই করল—যা চাল থেকে তুষ আলগা করে দেয়। সৌখীন সমাজতান্ত্রিকের দল হাওয়ায় মিশে গিয়ে যারা এ পরীক্ষায় টিঁকে রইল মার্ক্সের মত বিপ্লবী নেতা কেবল তাদের নিয়েই সুখী হতে পারেন। এক ইংল্যাণ্ড ছাড়া আর সব দেশই মার্ক্সের দিকে এ সময়ে সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল।

লণ্ডনে তখন হাঁটতে বেরুতেন বা পাহাড়ে উঠতেন গিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—শরীরের উপরের দিকটা বিরাট, সাদা দাড়ি, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। অনর্গল কথা বলে যেতেন তিনি। এই হাঁটবার বাই তাঁর বাড়িতে এলেও বন্ধ হত না। পড়ার ঘরে দরজা থেকে জানালা পর্যন্ত কার্পেটটায় জুতোর দাগে একটা পায়ে চলার পথ তৈরী হয়ে গিয়ে-ছিল। লণ্ডনে প্রচলিত নামই তাঁর—'রেড টেরোরিষ্ট ডক্টর'—কিন্তু বাড়িতে তাঁর প্রাণ খোলা উচ্চ হাসি শুনলে কেউ তাঁর মুখে সন্ত্রাস-

বাদের বাষ্পও খুঁজে পাবে না। পর পর সিগার টেনে যাচ্ছেন আর বলছেন: "ক্যাপিটেল লিখতে যতগুলো সিগার খরচ হয়েছে তার দামটাও উঠে এলো না!" উপন্যাস, নাটক, কবিতা পড়ে যাচ্ছেন তিনি অজস্র—হোমার, দান্তে, গ্যেটে, সেক্সপীয়র, হাইনে, ব্যালজ্যাক্, ডুমা, স্কট কেউ বাদ নেই। হয়ত বা আবার অবসর বিনোদন করছেন অঙ্ক করে। 'রেড টেরোরিষ্ট ডক্টর'-এর মন নিয়ে তিনি সাহিত্য-বিচার করতেন না—সে ক্ষেত্রে তাঁর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এসে কখনো উঁকি দেয়নি। অজস্র লোকের যাওয়া আসা চলে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়িতে—তারা সবাই বিপ্লবী পলাতক—উপদেশ, সাহায্য সব কিছুই তাদের দিতে হয়। ভদ্রলোকের স্ত্রী বলেন: "ওদের জন্যে আমাদের কাজের আর অন্ত নেই।" কম্যুনকারীরাও আসেন। তাঁদেরই একজন —চার্লস্ লোগুঁয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের মেয়ে জেনির বিয়ে হয়ে যায়।

মার্ক্সের অপর জামাতা লাফার্গের লেখা থেকে মার্ক্সের শেষ বয়সের এ-চিত্রই আমরা পাই।

রাষ্ট্রিক আকাশ হয়ত মার্ক্সের জন্যে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে ঘনিয়ে এল মেঘ। নিজের অসুস্থ দেহের বিড়ম্বনা ত ছিলই তার উপর তাঁর স্ত্রীর দেখা দিল ক্যান্সারের লক্ষণ। এই দুরারোগ্য ভীষণ ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়েও তিনি প্রসন্ন মুখেই পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। প্যারিসে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন মেয়েদের পছন্দসই জিনিষপত্র লণ্ডন থেকে কিনে নিয়ে। ফিরে এসে অবশ্যি তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না—মার্ক্সের হল প্লুরিসির আক্রমণ।

বাড়ির সামনের বড় কোঠায় শুয়ে আছেন একটি বৃদ্ধা—ক্যানসারের রোগিণী—তার পাশের ছোট কামরাটিতে তাঁর বৃদ্ধ স্বামী প্লুরিসিতে আক্রান্ত। একে অন্যকে দেখতে পান না তাঁরা—তবু একটু সুস্থতার ফাঁকে হয়ত উঁকি দিয়ে একজন অপর জনকে দেখতে চায়। জীবনে তাঁদের মিলনে কোথাও খুঁত ছিল না—আজও মৃত্যুর সামনে

দাঁড়িয়েছে এসে দুজনেই—কিন্তু তবু কেন এ ব্যবধান? ভালো হয়ে উঠল ক্রমে বৃদ্ধ—যেদিনই হাঁটবার ক্ষমতা হল তাঁর, স্ত্রীর বিছানার পাশে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। চোখে মুখে তখন তাঁদের আশ্চর্য দীপ্তি—যেন দু'টি যুবক যুবতী একসঙ্গে জীবন আরম্ভ করবার আয়োজন করেছেন—বয়েস ভুলে গেছেন তাঁরা, ভুলে গেছেন—এবার যে বিদায়ের পালা সুরু করতে হবে।

৩০শে নভেম্বর—১৮৮১-তে মার্ক্সের হাতে একটি ইংরেজী কাগজ এলো—বেলফোর্ট ব্যাক্স নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক তাতে মার্ক্সের জীবন ও ভাবধারা নিয়ে প্রশংসামূলক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ইংল্যাণ্ড থেকে সেই প্রথম খ্যাতি-লাভ তাঁর। মৃত্যুপথযাত্রিণী স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন প্রবন্ধটি মার্ক্স। ফ্রাউ মার্ক্সের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, আমরা অনুমান করতে পারি। যে মহৎ আদর্শের পেছনে তিনি তাঁর জীবনকে নীরবে নিবেদন করে গেছেন সে আদর্শের দিকে চোখ ফিরাল কি তবে দেশবিদেশ? স্বামীর উৎফুল্ল, কোমল মুখের দিকে চেয়ে ফ্রাউ মার্ক্স আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন। ২রা ডিসেম্বর—দুদিন পরে—মারা গেলেন তিনি এই সান্ত্বনাটুকুই শেষ প্রাপ্য হিসেবে পেয়ে। হয়ত তাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় পাওয়া।

স্ত্রীর মৃত্যুর দিন থেকেই মরতে সুরু করলেন মার্ক্স। তারপর যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন তাকে আর বাঁচা বলা যায় না। মানসিক পঙ্গুতা ছাড়াও ফুসফুসের দুর্বলতা তাঁর আর সাড়ল না। ডাক্তারের উপদেশে তিনি অ্যালজিয়ার্সে গেলেন—সেখানে অত্যধিক ঠাণ্ডায় আবার প্লুরিসি আক্রমণ হল—গেলেন মণ্টি কার্লোতে, সেখানেও তা-ই। তারপর মেয়েদের কাছে কিছুদিন থেকে শরীর কিছুটা ফিরতে সুরু করল তাঁর।

কিন্তু মৃত্যুর বীজ ঢুকেছিল মার্ক্সের দেহে—ঘনিয়ে আসছিল তাঁর জীবন-সন্ধ্যা। জীবনের হিসাব নিকাশে তাঁর হাতে লাভের পুঁজি ছিল শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্য, স্ত্রী আর সন্তানদের জীবনে তা-ই কেবল তুলে

দিতে পেরেছেন তিনি। নিষ্ঠুর পৃথিবী তার চেয়ে বেশি কিছু সম্পদ এই সম্পদের ব্যাখ্যাকারকে দিতে চায় নি। মনের ভাণ্ডারেও কি খুব বেশি পেয়ে গেলেন মার্ক্স? বিপ্লবের হাতে জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন—বিপ্লব তার প্রতিদানে কি দিল তাঁকে? কিছু নয়। শুধু আশার পর আশাই করে গেছেন মার্ক্স—এই বুঝি বেজে উঠল বিপ্লবের জয়ডঙ্কা—কান পেতে ছিলেন তিনি অহরহ—কিন্তু হল না বিপ্লবের আবির্ভাব। ফিরে কিছু পান নি বলে দিয়ে যেতে তাঁর সঙ্কোচ ছিল না কিছু। পৃথিবীর ঋণ শোধ করে দিয়ে গেলেন তিনি, তাঁর চিন্তার সম্পদ ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিয়ে। তারপর তিনি মুক্ত। দেনা পাওনার হিসেব আর তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর নেই! রিক্ততা নিয়েই মৃত্যুর দিকে পা বাড়ালেন মার্ক্স।

দু বছর পর তাঁর মেয়ে জেনি মারা গেল। লণ্ডনে ফিরে এলেন তিনি ব্রঙ্কাইটিস্ নিয়ে—ক্রমে তা ল্যারিংজাইটিস্-এ গিয়ে দাঁড়াল। শুধু দুধের উপর বেঁচে রইলেন তিনি। তার উপর ফুস্ফুসে টিউমারের লক্ষণও দেখা দিল—ওষুধ আর তখন কোনো কাজই করছে না—বরং ওষুধ খেতে খেতে হজমশক্তি তাঁর একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দিন দিন শরীর কেবল দুর্বল হয়েই চলল। তারপর ১৮৮৩ সনের ১৪ই মার্চ বিকেল-বেলা ইজি চেয়ারে যখন বসেছিলেন মার্ক্স—হঠাৎ তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—পাশে তাঁর তখন কেউ ছিল না—খানিকক্ষণ পর এঙ্গেল্স্ গিয়ে দেখলেন, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলের চিন্তা করা বন্ধ হয়ে গেছে—ঘুমিয়ে আছেন মার্ক্স, যে ঘুম আর ভাঙবে না।

স্ত্রীর কবরেই কবর দেওয়া হল মার্ক্সকে—আর কোনো অনুষ্ঠান হল না। কবরের পাশে দাঁড়ালেন লেস্নার, লক্নার, লাফার্গ, লোগুঁয়ে, লাইব্‌ক্নেক্ট আর এঙ্গেল্স্। মৃত বন্ধুর উদ্দেশ্যে এঙ্গেল্স্ কয়েকটি কথা বললেন—তাতে উচ্ছ্বাস নেই—আছে শুধু একটি সার্থক জীবনের মূল্য নির্দেশ—আর আছে এই সত্য কথা:

“ডারউইন যেমন জৈবিক প্রকৃতির বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার

করেছিলেন, মার্ক্স তেমনি মানুষের সমাজ-প্রকৃতির বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। কথাটি অতি সাধারণ কিন্তু তা আদর্শবাদের জঞ্জালে চাপা পড়েছিল। সে কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্মের দিকে মনোযোগ দেবার আগে মানুষকে খেতে-পরতে হয়, হয় বাসস্থান নির্মাণ করতে।......রাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রই তাঁকে থাকবার ঠাঁই দেয়নি—রক্ষণশীল বা গণতান্ত্রিক সব রকম বুর্জোয়ারাই তাঁর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেছে। মাকড়সার জালের মত তিনি তা পাশে সরিয়ে উপেক্ষা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু গৌরবময় —সাইবেরিয়ার খনি থেকে আরম্ভ করে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী শ্রমিক তাঁকে ভালোবেসেছে—আজ তাঁর মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন করছে।......বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন—বেঁচে থাকবে তাঁর সৃষ্টি।”

# মার্ক্সীয় দর্শন

অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে মার্ক্স কোনো রকম দর্শন-প্রস্থান তৈরী করে যান নি, অর্থনীতিই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়—তিনি প্রসঙ্গত দার্শনিকতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন মাত্র। 'ওয়েবষ্টার ইণ্টারন্যাশন্যাল ডিক্‌শ্‌নারি' বলে : 'দর্শন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সমস্ত বস্তুর একটা সুসম্বন্ধ ধারণা উপস্থিত বা তৈরী করে তুলবার চেষ্টা করে। তাকেই দার্শনিক পদ্ধতি বলা যায় যা সমস্ত বা কতিপয় বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধের সন্ধান দেয়।' কাজেই দর্শনকে যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে হ'বে এমন কিছু শাসন নেই—বিজ্ঞান নিয়েও তার কারবার চলে।

মার্ক্সীয় দর্শন ধর্মতত্ত্ব নয়, বিজ্ঞানতত্ত্ব। ধর্মচর্চা যেমন ভাববাদের জন্ম দিয়েছিল, বিজ্ঞানচর্চা তেমনি জড়বাদের জন্ম দিয়েছে। ভাববাদ ও জড়বাদের বিরোধ বহুদিন যাবৎ দর্শনের অতি প্রত্যক্ষ। মার্ক্সের মতবাদে জড়বাদ সর্বশেষ পরিণত রূপ লাভ করেছে। মার্ক্সের 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' এমন একটি বিজ্ঞান যা জড়বস্তুতে মৌলিকতা আরোপ করে, গতির নিয়ম, প্রকৃতির বিবর্তন, মানুষের সমাজের ও চিন্তার উন্নতি নির্ণয় করে।

বেকন, হবস্‌, লক্‌ এবং আঠারো শতকের ফরাসী জড়বাদীরা জড়বাদের যে সূচনা করে গিয়েছিলেন, তার স্থূলতা ও যান্ত্রিকতাকে বর্জন করে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ জৈব প্রকৃতির জীবন-ধর্মকে গ্রহণ করেছে, জড়বাদকে দ্বান্দ্বিকতা ও ঐতিহাসিকতার পথে গতিশীল করে দিয়েছে।

বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল আবেষ্টনীতে উনিশ-শতকীয় ভাববাদী জার্মাণ দর্শনশাস্ত্রের শরীরে যুক্তিবাদের প্রশ্রয় ছিল প্রচুর। ইমানুয়েল কাণ্টই এই যুক্তিবাদের পথে প্রথম পথিক। বিজ্ঞানের সার্বিক তত্ত্বগুলো বিচার

করে তিনি অভিজ্ঞতার অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন; তাঁর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়ে বস্তুসত্তাকে জানা যায় না—বস্তুর বস্তুত্ব মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে। কান্টের যুক্তিবাদী দর্শনকে পরিণত করে তোলেন হেগেল। যে-জ্ঞানকে কান্টের দর্শন মায়িক এবং অভিজ্ঞতার সীমায় আবদ্ধ বলে বর্ণনা করেছিল—তাকে হেগেলের দর্শন গতিশীল, সৃষ্টিশীল, বাস্তব বলে প্রমাণ করেছে—হেগেলের মতে জ্ঞানের অগম্য কিছুই নেই। কান্টের দর্শনে দ্বান্দ্বিক-পদ্ধতির মূলসূত্র নিহিত থাকলেও তা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রমাণের জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিশ্বগতির স্বরূপ নির্ণয়ে নিয়োজিত, তাঁর মতে নৈয়ায়িক চিন্তার অভিব্যক্তিতে, জগতের ও ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে দ্বান্দ্বিকতার ত্রয়ী—প্রস্তাব, বৈপরীত্য ও সমন্বয়—বর্তমান। কান্টের বিরুদ্ধবাদ সীমাবদ্ধতায় উপনীত হয়েছে, হেগেলের বিরুদ্ধবাদ সমন্বয়ে তৃতীয় রূপ লাভ করেছে। কান্ট জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের মন সন্দিগ্ধ করে তোলে কিন্তু হেগেল তাঁর নৈয়ায়িক জ্ঞানকে অদ্বৈত-প্রজ্ঞানেরই (Absolute Reason) বিশেষ প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। অদ্বৈতবাদ হেগেলীয় দর্শনের মূলাধার। চৈতন্য স্বরূপ অদ্বৈতকে তিনি জগতের অন্তর্নিহিত কারণ রূপে প্রমাণ করতে প্রয়াসী।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে অনুভূতির আশ্রয়েই কান্ট নিজেকে টেনে নিয়ে গেলেন, হেগেল জগৎকে বাস্তব হিসেবে গ্রহণ করেও রহস্য-বাদের হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারলেন না। তাঁদের চিন্তা-ধারায় ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হল সন্দেহ নেই কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনের মূল তত্ত্বগুলো পড়ে রইল গবেষণার বাইরে। অবশ্যি একথা অস্বীকার করা যায়না যে এই দুই দার্শনিকের বিরাট প্রতিভা মানুষের বাস্তব জীবনকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রচুর সাহায্য করেছে। বামপন্থী হেগেলীয় দলের ফয়ারব্যাকের মতবাদে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ফয়ারব্যাক বললেন: "প্রকৃতি মানুষের অথবা মনের তৈরী বস্তু নয়। কিন্তু প্রজ্ঞানবাদী দর্শন বা ভাববাদের

দৃষ্টিতে তা কান্টের স্বতন্ত্র সত্তা, বাস্তবতাবর্জিত বিমূর্ততা। এই প্রকৃতিই ভাববাদের পতনের কারণ। আজকের দিনের প্রকৃতি-বিজ্ঞান আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয় যে-অবস্থায় মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। তার মানে পৃথিবী তখন মানুষের দৃষ্টি বা মনের বিষয় হয়ে ওঠেনি, কাজেই প্রকৃতি ছিল তখন মানুষ-নিরপেক্ষ বস্তু।" প্রকৃতির মানুষ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বোঝাতে ফয়ারব্যাক কান্টের 'স্বতন্ত্র সত্তা' (thing-in-itself) বোঝান নি, তিনি বলতে চান যে মানুষের জানার অপেক্ষা না করেও জড়জগতের অস্তিত্ব বর্তমান, তার বাহ্যরূপ মূলত তার প্রকৃত রূপেরই অনুবর্তী এবং তা অজ্ঞেয় নয়। জড়বাদের প্রাথমিক প্রতিপাদ্যই তা-ই। বস্তুর অজ্ঞেয় রূপ সম্পর্কিত কান্টের মতবাদের প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হয়ে জড়বাদ ফয়ারব্যাকের আশ্রয়েই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ এঙ্গেল্‌স্ এবং জোসেফ ডিট্‌ৎসেনকে কান্টের মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করবার পথে বিস্তর সাহায্য করেছে।

মার্ক্স প্রথমে হেগেল-পন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—কিন্তু তাঁর জড়বাদী মন হেগেলের ভাববাদে বেশিদিন আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারেনি, ফয়ারব্যাকের জড়বাদী দর্শন তাকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে নিয়েছিল। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাসের ধারণা করতে গেলে হেগেলের মতবাদের নির্ভুল সমর্থন পাওয়া মুস্কিল, অদ্বৈতপ্রজ্ঞান বা অদ্বৈতচৈতন্য দ্বন্দ্ববাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বন্দ্ববাদ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দাঁড়াতে পারে, হেগেলের আত্মজ পদ্ধতি (a priori method) অবলম্বন করলে তা নিরালম্বই হয়ে পড়ে। মার্ক্স বললেন: "আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে শুধু মূলতই হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক তা নয়, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। চিন্তার পদ্ধতিকে 'ভাব' আখ্যা দিয়ে হেগেল তাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ী (subject) করে তুলেছেন এবং বলেছেন তা-ই বাস্তব জগতের সৃষ্টিকর্তা, এই 'ভাবে'রই দৃশ্যমান বাহ্যরূপ হল বস্তু-জগৎ। কিন্তু

আমার কাছে 'ভাব' হচ্ছে তা-ই, মানুষের মন থেকে যা বস্তু জগতের প্রতিফলন সম্ভব করে তোলে এবং চিন্তায় রূপগ্রহণ করে।" মার্ক্স বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অদ্বৈত চেতন্যের আসনে বসিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি বললেন: "মানুষের চৈতন্য মানুষের সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, মানুষের সামাজিক অবস্থাই তাদের চৈতন্যের নিয়ন্তা।" এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে—এই দৃষ্টির আলোতে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা দরকার। মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ সেই ইতিহাসেরই নির্ভুল ব্যাখ্যা।

মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ ফয়ারব্যাককেও খুব বেশি প্রশ্রয় দিতে পারেনি। ফয়ারব্যাক মানুষকে প্রাকৃতিক জীবের সীমাতে গণ্ডীবদ্ধ করে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মনোভাবে অভিভূত হয়ে গেছেন। সামাজিক জীবের প্রকৃত স্বরূপে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন ফয়ারব্যাকের মনে উঁকি দিতে পারেনি—প্রাকৃতিক জীবের গণ্ডী থেকে মানুষকে মুক্ত করে মার্ক্স তাকে সমাজের গতিশীলতায় মনুষ্যত্ব দান করলেন। কর্মরত মানুষের বিবর্তনের আলোতে তিনি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সব কিছুর অস্তিত্বকেই বিশ্লেষণ করে দেখালেন। এ বিবর্তন গতির বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে হয়ে যাচ্ছে। নেতির নেতিত্ব ঘোষণা করে ক্রমান্বয়ে নীচু স্তর থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে চক্রাকারে। বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন যেমন গুণগত পরিবর্তন এনে দেয়, মানুষের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই তা হয়ে চল্‌ছে। মানুষের জীবন ধারণের ব্যবস্থা দ্বান্দ্বিকতার পথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে—এবং প্রতিপদে সে সব প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত ভাবের জন্ম দেয়। স্বাধীন ভাবে কোনো ভাব-প্রক্রিয়া বাস্তবকে সৃষ্টি করতে পারে না—বাস্তব একটা ভাবের বহিপ্রকাশ নয়।

মার্ক্স বললেন, বস্তুজগতের একটা ধারণা নিয়ে মানুষ চুপ করে বসে থাকে না—বা জড়প্রকৃতিদ্বারা শাসিত হয় না। জড় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্ঘাতে মানুষ নিজের প্রকৃতি পরিবর্তিত করে চলে। এ

পরিবর্তনে মানুষের উপর জড়প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া ত আছেই, তাছাড়া আছে জড়প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিক্রিয়া। কাজেই দর্শনের মত দ্বান্দ্বিক জড়বাদ জগৎকে বিশ্লেষণ করেই নিরস্ত থাকে না, দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সূত্র অনুসারে মানুষের কর্মক্ষমতা জগৎকে পরিবর্তন করে দেয়। ব্যক্তির পরিবর্তন সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলে পুরোনো সমাজের গর্ভে বিনাশের বীজ জন্ম নেয়, দুয়ের সংঘাতে নূতন সমাজ জন্মগ্রহণ করে। ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য কিছুই কোনো বিমূর্ত ও স্বাধীন ভাব-উৎস থেকে প্রবাহিত নয়, সবই তা'রা সমাজজাত বস্তু। প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের যুদ্ধের ফলেই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—ধর্ম মানুষের সহজাত নয়—মার্ক্স তাই বললেন : "ধর্ম হচ্ছে নির্যাতিত প্রাণীর রোদন, হৃদয়হীন বিশ্বের ভাবাবেগ, প্রাণহীন অবস্থার প্রাণ। ধর্ম মানুষের আফিং।"

# ইতিহাসের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ

হেগেলের বিরুদ্ধে মার্ক্স ই যে প্রথম নিজস্ব মতবাদ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা নয়—জার্মাণ দার্শনিক ফয়ারব্যাক মার্ক্সের আগেই ধর্মকে নৃতত্ত্বের আলোতে বিশ্লেষণ করে দেখান। ফয়ারব্যাকের সিদ্ধান্তের সুরুতে মানুষ এল সত্যি কিন্তু সে-মানুষ কর্মঠ নয়, নিজেকে এবং সমাজকে সে পরিবর্তন করেও চলে না। কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টিই যে মানুষের সমাজ নয়—সামাজিক বন্ধনের সমগ্রতা দিয়েই সে সমাজ তৈরী এই উপলব্ধি তাঁর ছিল না। প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি বস্তু হিসেবে মানুষকে ফয়ারব্যাক ধরে নিয়েছেন, ইতিহাসের বিবর্তনের পথে যে মানুষ সমাজ-বদ্ধ কর্মঠ জীব—এ তত্ত্ব তাঁর কাছে অবিদিতই থেকে গেছে। মার্ক্স নূতন ধরণে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করলেন—যা সুযৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক।

মানুষই ইতিহাস তৈরী করে কিন্তু সে তার খুসী মাফিক তা তৈরী করতে পারে না। ইচ্ছামত একটা অবস্থা সৃষ্টি করে যে মানুষ ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যাবে—এমন নয়। যে অবস্থা তৈরী থাকে—অথবা যা অতীত থেকে তার সামনে উপস্থিত হয় তার উপর নিজের অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়াতেই তৈরী হতে থাকে মানুষের ইতিহাস। কাজেই মানুষের ইতিহাসের গোড়ায় জীবন্ত মানুষের অস্তিত্ব ধরে নিতে হবে। মানুষের দৈহিক গঠন এবং তার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকেই ইতিহাসের সুরু। দৈহিক গঠনই তার জীবন ধারণের উপায় বাৎলে দিয়েছিল—এবং সে উপায় অবলম্বন করেই সে বুঝতে শিখল যে প্রাকৃতিক অন্যান্য প্রাণী থেকে সে স্বতন্ত্র। জীবিকার উপায় উৎপাদনের উপরই মানুষ নিজেকে তৈরী করে যায় তাতেই মানুষের রূপ ও রং প্রতিভাত হয়। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে

আবদ্ধ হতে লাগল—সেই সম্বন্ধের রকমও উৎপাদন প্রণালীর উপরই নির্ভর করত। প্রত্যেকটি নূতন উৎপাদন শক্তির (যেমন চাষের জন্য নূতন জমি দখল) ব্যবহারে পরিণামে শ্রমবিভাগে নূতন পরিবর্তন করতে হত। একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ জীবিকার্জনের উপায়ের উপরই নির্ভর করতে লাগল। মানুষের এই সম্বন্ধের উপর সামাজিক ব্যবস্থার নানা স্তর দেখা যায়—যেমন—একপুরুষপ্রধান, দাসত্ব, সামন্ততান্ত্রিক যুগের জমিদারী এবং সবশেষে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। শ্রমবিভাগের প্রত্যেকটি ধাপই বিত্তের এক একটি রূপ; শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যে, উৎপাদক যন্ত্রে বা উৎপাদনের উপাদানে বিত্তই মানুষের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করে দেয়।

প্রথমত বিত্ত থাকে স্বল্পউৎপাদনক্ষম কোনো গোষ্ঠী বা কৌমের অধিকারে। তখন দেখা যায় একদল মৃগয়াজীবী ও মৎস্যজীবী লোক —পশুপালন ও ভূমিকর্ষণের মাত্র তখন সুরু। পারিবারিক শ্রমবিভাগ এবং সমাজরূপ ক্রমেই একপুরুষপ্রধান গোষ্ঠীতে গিয়ে পরিণত হয়। পিতৃপ্রধান পারিবারিক ব্যবস্থায়ই দাসত্বের বীজ উপ্ত ছিল, কেননা স্ত্রী ও সন্তানের উপর মানুষের কর্তৃত্ব ছিল অগাধ—লোকসংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এবং একদলের সঙ্গে অপরদলের যুদ্ধবিগ্রহ বা দ্রব্য বিনিময়ের সূত্রে সমাজে দাসত্ব প্রথা আমলে এসে গেল।

যুদ্ধজয় এবং দাসত্বপ্রথার ক্রমবিস্তারের ফলে প্রাচীন নাগরিক রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এ ব্যবস্থার গোড়ার দিকে বিত্ত গোষ্ঠীভোগ্যই ছিল কিন্তু শেষটায় অস্থাবর-স্থাবর সব রকম সম্পত্তিই ব্যক্তির অধিকারে এসে গেল। সমাজ-ভোগ্য বিত্তের বিরোধী শক্তি হিসেবে ব্যক্তি-ভোগ্য বিত্তের জন্ম হল। ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রাধীন সম্পত্তির নিয়ম অনুসারেই পরিচালিত হত। রাষ্ট্র যেমন দাসত্বের প্রভুত্ব নিজ হাতে নিয়ে এল, তেমি ভূস্বামীরাও নিজেদের প্রয়োজনে দাস নিয়োগ করতে সুরু করলেন। ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার প্রাচীন প্রথার বিনাশ সূচনা করে, কেননা আগেকার নিয়ম ছিল জমি এবং দাস সর্বভোগ্য।

নাগরিক জীবনে শ্রমবিভাগ হয়ে উঠল জটিলতর, সামুদ্রিক বাণিজ্যে এবং শিল্পোৎপাদনে এই বিভাগটা স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। যুদ্ধবিগ্রহ বা লুঠতরাজ আর তখন শিল্পোৎপাদনের প্রেরণা জোগাত না—ধনসঞ্চয়ই ছিল তার লক্ষ্য। এভাবে প্রচীন জগতে উৎপাদনের ভিত্তিই হয়ে উঠল দাসত্বপ্রথা।

বিত্তের তৃতীয় স্তর সামন্ততন্ত্রবাদ। প্রাচীন যুগ নগরের উপর ছিল নির্ভরশীল, মধ্যযুগ নির্ভর করল পল্লীর উপর। বর্বর হূণশক্তির আক্রমণে য়ুরোপের নগরগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়াতে আর সেই সঙ্গে জার্মাণ অস্ত্রশক্তির প্রভাবে য়ুরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হল। গৃহদাসের স্থান অধিকার করল ভূমিদাস ( serf )—গোষ্ঠীপতির প্রভুত্ব এল সামন্ত-রাজের হাতে। পল্লীর বিত্ত বণ্টনের প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তিতেই নগরে তৈরী হল শ্রমশিল্পীসংঘ ও বণিকসংঘ। নাগরিকদের বিত্তও ছিল নিজস্ব শ্রমোপার্জিত—পুঁজিবাদীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। সমাজ-গঠনের এই অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে তার রাষ্ট্রিক কাঠামোর গরমিল হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দেশজয় শুধু সামন্তরাজদের প্রয়োজনেই হয়নি, নগরগুলোর প্রয়োজনও উপেক্ষা করবার মত নয়। কাজেই দেখা যায়, মানুষের উৎপাদনোপযোগী কাজকর্মের উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করেছে—অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে-সমাজ ইতিহাসে যখন দাঁড়িয়ে গেছে সে সমাজপ্রসূত বাস্তবতার দ্বারাই মানুষের ভাব, চিন্তা ও মননশীলতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। রাষ্ট্র একটা অতিপ্রাকৃত ভাবধারায় কলেবর লাভ করেনি। "মানুষের চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, জীবনের ধারাই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।" সমাজ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে। যারা সেই উৎপাদন শক্তির প্রতীক তারা কোনো এক বিশেষ অবস্থায় এসে উৎপাদন-সম্বন্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। "এই সম্বন্ধ তখন উৎপাদন-শক্তির উন্নতির কারণ না হয়ে তার পায়ে শিকলের মতই জড়িয়ে ধরে। তাইতেই সুরু হয় সমাজ-বিপ্লব। একটি মানুষ নিজ সম্বন্ধে যা চিন্তা

করে তা দিয়ে যেমন তাকে বিচার করা ভুল, তেমনি একটা বিপ্লবের যুগকে তার নিজস্ব চেতনা দ্বারা বিচার করা যায় না, আর চেতনা বিশ্লেষণ করতে হয় বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে—উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির বিরোধের ভিত্তিতে। যতাদন না সমাজ উৎপাদন-শক্তিকে উন্নত করে নিজে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ততদিন পর্যন্ত তার পতন ঘটে না। আর নতুন ও উন্নততর উৎপাদনশক্তিরও পত্তন হতে পারে না যতদিন না সে-শক্তির বাসোপযোগী বাস্তব অবস্থার লক্ষণ পুরানো সমাজের দেহে প্রকাশ পায়।" কাজেই দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদকে অনুসরণ করে বলা যায় যে উৎপাদন-শক্তির বিবর্তনের পথে কোনো বিশেষ স্তরে সমাজ-ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় 'প্রস্তাব' ( thesis ) —সে-ই তার বৈপরীত্যের (Antithesis) জন্ম দেয়—এই প্রস্তাব ও বৈপরীত্যের বিরোধের ফলে জন্ম নেয় এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা (Synthesis) যেখানে উৎপাদন-শক্তি উন্নততর ও মুক্ততর রূপ নিতে পারে।

ব্যক্তিগত বিত্ত সঞ্চয়ের পদ্ধতি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দেহে যে একদল পুঁজিপতি তৈরী করে তুলছিল—ষ্টীম এঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে তাদের পুঁজিবাদ ফেঁপে উঠবার একটা পথ দেখতে পেল। হস্তশিল্পে যে পরিমাণ দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন তা কমিয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদক শ্রমিকদের বেকার করে তোলে। শ্রমিককে দাসে পরিণত করে রাখবার দরকার তখন আর ছিল না—কেননা শ্রমিক ছিল বেশি, তার প্রয়োজন হয়ত ছিল কম। শ্রমিকের কাজ করা ছিল ইচ্ছাধীন—বেতনের চুক্তিতে সে পুঁজিপতির সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ হত। যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবের আশ্রয়ে উৎপাদন প্রণালীর এই পরিবর্তনে সমাজে অসাধারণ পরিবর্তন দেখা যায়—একদিকে প্রত্যক্ষ উৎপাদকরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে উৎপাদন যন্ত্র হাতছাড়া করে বসল আর হয়ে উঠল শ্রমবিক্রেতা আবার অন্যদিকে পুঁজিপতিরা একটা শ্রেণী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল, তাদের সঞ্চয়ের নেশা লক্ষ লক্ষ লোককে বিত্তহীন করে

তুলল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে হস্তশিল্পের সঙ্ঘমুখ্যদের প্রভাব ছিল বিস্তর—তাদের স্থান দখল করে নিল পুঁজিপতিরা। তারা দাবি জানিয়ে বসল তাদের স্বাধীনতা দরকার—একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার স্বাধীনতা তাদের থাকবে—অধিকার থাকবে শ্রম-বিক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি করবার? এই অধিকারের দাবী নিয়ে সামন্ত-রাজপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের গোল বেধে যায়। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের স্থিতিবান অবস্থায় তারা নেতিমূলক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবের ভেতর দিয়ে এই নূতন শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা চলে আসতেই হল বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা। এ সমাজও বেতনভুক শ্রমিকের দাসত্ব দিয়েই সুরু হল—শোষণযন্ত্র চলে গেল সামন্তরাজের হাত থেকে পুঁজিপতির হাতে। কাজেই দেখা যায় মানুষের ইতিহাস শ্রেণীদ্বন্দ্ব পরম্পরা ছাড়া কিছু নয়। একেক যুগে একেকশ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রাধান্য ঘুচিয়ে সমাজে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে চলছে। রাষ্ট্র সেই শাসকশ্রেণীর স্বার্থ-বিধানের যন্ত্র মাত্র। "বুর্জোয়া উৎপাদন সম্বন্ধ সামাজিক প্রণালীর সর্বশেষ বিরোধাত্মক রূপ —এই বিরোধের জন্ম হয় ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা থেকে। অবশ্যি বুর্জোয়া সমাজের ভেতরকার উৎপাদন-শক্তিই (শ্রমিক) এই বিরোধিতাকে দূর করবার বাস্তব অবস্থা তৈরী করে তোলে। এই সমাজের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সমাজের প্রাথমিক ইতিহাস শেষ হয়।" কিন্তু এই ইতিহাস শেষ হতে হলে সমাজে কতকগুলো অবস্থা তৈরী হওয়া চাই। সহস্র সহস্র লোকের বিত্তহীন অবস্থায় এসে পৌঁছান দরকার—যাতে তারা বিত্ত সঞ্চয়ের অত্যাচার মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। তাছাড়া উৎপাদনের যান্ত্রিক শক্তিরও প্রাচুর্য্য থাকা চাই। তা না হলে সার্বজনীন দারিদ্র্যের সম্ভাবনাই থাকে বেশি। যান্ত্রিক শক্তির প্রাচুর্য্যের মানে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য। এ সব অবস্থা কেবল একটি দেশে আবদ্ধ থেকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। স্থায়ী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার বহু দেশে যান্ত্রিক শক্তির প্রাচুর্য্য

এবং বিত্তহীন শ্রমিকের উদ্ভব। সার্বজনীন বিপ্লবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সার্থকতা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিরসন করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। বুর্জোয়া সমাজের সব রকম শ্রেণীর মধ্যে বিত্তহীন শ্রমসর্বস্বরাই শুধু শ্রেণীর প্রতি মমতাহীন—তারা এমনই একটি শ্রেণী শ্রেণীস্বার্থ বাঁচিয়ে রাখবার যাদের দরকার নেই—শ্রেণীকে ধ্বংস করাই যাদের লক্ষ্য। কাজেই শ্রমসর্বস্বের বিপ্লব অন্যান্য সামাজিক বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে তারা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। মানবের এবং ব্যক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি এই বিপ্লবে নিহিত।

"সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাউকে কোনো বিশেষ রকম কাজে আত্মনিয়োগ করবার দরকার নেই। কাজের প্রত্যেক বিভাগে গিয়েই সে ভিড়তে পারে। সামাজিক উৎপাদন সেখানে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত। আমি আজ এক কাজ, কাল আরেক কাজ করতে পারি। ভোরে করলাম শিকার, বিকালে মাছ ধরলাম, গো-পালনে মন দিলাম সন্ধ্যায় —খেয়ে-দেয়ে রাত্রে হয়ত লিখতে বসলাম—সবই আমার ইচ্ছা অনুসারে করে যাচ্ছি—কোনো সময়ই শিকারী, মৎস্যজীবী, গো-পালক বা লেখক বনে যাচ্ছি না।" এ সমাজ শ্রমবিভাগের অবসান করে শ্রেণীর অবসান করবে, সম্পদ-সঞ্চয়ের অবসান করে শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরসন করবে। উৎপাদনের জন্যেই যে শ্রমিকের অস্তিত্ব তা আর থাকবে না —উৎপাদন হবে শ্রমিকের ভোগের জন্য।

# মার্ক্সীয় অর্থনীতি

যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে ব্যাখ্যা করবার মত অর্থনীতিজ্ঞের জন্মও বুর্জোয়া সমাজ দিয়েছে। অ্যাডাম স্মিথ্ বা রিকার্ডোর নাম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালীতে মানুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে এবং শ্রমবিভাগকে, ঋণ, টাকা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে এই অর্থনীতিজ্ঞরা শাশ্বত ও চিরন্তন আখ্যা দিয়ে গেছেন। এ সব সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে কি করে উৎপাদন হয়ে আসছে কেবল এটুকু বিশ্লেষণ করে দেখানোই ছিল তাঁদের কাজ—এ সম্বন্ধগুলো কি ভাবে উৎপাদিত হয়, ইতিহাসের কোন্ গতি কি ভাবে তাদের জন্ম দেয় তাঁরা ততটুকু বিশ্লেষণ করে দেখান নি। শুধু বুর্জোয়া অর্থনীতিজ্ঞরাই নন, শ্রমিকের মুক্তিকামী প্রুধঁও অর্থনীতির এই তৈরী বিষয়গুলো হাতের কাছে পেয়ে তাদের ভেতরকার সম্বন্ধকে নীতি হিসেবে বা বিমূর্ত ভাব হিসেবে ধরে নিলেন। উৎপাদন সম্বন্ধের ঐতিহাসিক গতিবেগে যে এই বিষয়গুলো তৈরী হয়ে চলেছে তা যদি আমরা ভাবতে না পারি—তাহলে তাদেরকে নৈর্ব্যক্তিক বিচারের ফল বলে গণ্য করতে হয়। নৈর্ব্যক্তিক বিচারের বাইরে এমন কোনো ভিত্তি নেই যার উপর সে দাঁড়াতে পারে, এমন কোনো বস্তু নেই যার বিরোধিতা করতে পারে বা এমন কোনো বিষয় নেই যা সে তৈরী করতে পারে। এই বিমূর্ততা দিয়ে আমরা সমস্ত জগৎকে ন্যায়ের কতকগুলো সূত্রে (লজিক্যাল ক্যাটাগরিতে) এনে উপস্থিত করি। সমস্ত গতি বা উৎপাদন হেগেল-বর্ণিত 'শাশ্বত রীতি'র পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। হেগেল ধর্ম ও আইনশাস্ত্রকে যে দশায় ফেলেছিলেন প্রুধঁ রাষ্ট্রনৈতিক অর্থশাস্ত্রকে তা-ই করে তুললেন। দার্শনিকদের মতো জিনিষকে উল্টে ধরলেন।

তিনি। অর্থনীতিজ্ঞ প্রুধঁ কিন্তু জানতেন যে মানুষ উৎপাদন সম্বন্ধের একটা নিশ্চিত ভিত্তিতে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করে কিন্তু এই ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক সম্বন্ধও তৈরী হতে থাকে তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। "উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে জড়িত। নূতন উৎপাদন শক্তি পেতে হলে মানুষকে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন করতে হয়—আর উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন করতে হলে তাদের জীবিকা-উপার্জন পথেও পরিবর্তন আসে—ফলে সামাজিক সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে যায়। হাতে চালানো 'মিল' আনে সামন্তরাজের সমাজ, বাষ্পচালিত 'মিল' আনে শিল্পোৎপাদক পুঁজি-পতির সমাজ।" যে সব মানুষ বাস্তব উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে মিল রেখে সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে তারাই সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে মিল রেখে রীতি, নীতি, ভাব প্রভৃতির জন্ম দেয়। এসব ভাব বা ক্যাটাগরি-প্রকাশক সম্বন্ধগুলো যখন শাশ্বত নয়—তারা নিজেরাও তাই শাশ্বত হতে পারে না। তারা ঐতিহাসিক ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু।

অর্থনীতির সূত্রগুলোতে প্রুধঁ দুটো দিক আবিষ্কার করেছিলেন—ভালো দিক আর মন্দ দিক। মন্দ দিকটাকে বর্জন করে ভালো দিকটাকে রক্ষা করলেই তাঁর মতে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কাজেই তাঁর কাছে দ্বান্দ্বিক গতির মানে হয়ে দাঁড়ায় 'ভালমন্দ সম্পর্কে নিজের অভ্রান্তিক বিচার, আর তা-ই তা নীতির কোঠায় এসে বন্দী হয়ে পড়ে। এই নীতির তাড়নায়ই না কি মানুষ তায় পরমকল্যাণ সাম্যের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থনৈতিক সম্বন্ধগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে এই পরম লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যেই। এই সাম্যকে প্রুধঁ 'সৃষ্টিরাজের ধাতু'-র পর্যায়ে এনে ফেলে এমন কি বিধাতার লক্ষ্যবস্তুর সামিল করে তুলেছেন। আর তা করে তিনি অর্থনৈতিকের সঙ্গে ধার্মিকের কোনো তফাৎ রাখতে চান নি।

ধর্মশাস্ত্রজ্ঞরা যা করে থাকেন অর্থনীতিজ্ঞরাও অবিকল তাঁদের মতই আচরণ করে যাচ্ছেন। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞের মতে ধর্ম দু রকম—স্বধর্মকে

তাঁরা মনে করেন অপৌরুষেয়, ঈশ্বর থেকে আবির্ভূত আর পরধর্মকে ভাবেন মানুষের তৈরী। অর্থনীতিজ্ঞরাও নিজেদের সমাজকে ভাবেন স্বাভাবিক এবং সমাজের অন্য ব্যবস্থাকে মনে করেন অস্বাভাবিক—সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে অস্বাভাবিক ভেবে নিয়ে নিজেদের বুর্জোয়া সমাজকে তাঁরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁদের সমাজে বিত্তোৎপাদন বা উৎপাদন শক্তির উন্নতি প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ে যাচ্ছে এ রকমই তাঁদের ধারণা। কাজেই অর্থনৈতিক সম্বন্ধগুলো তাঁদের বিচারে চিরন্তন নিয়ম ছাড়া কিছু নয়। যতদিন প্রাকৃতিক নিয়মে এসে সমাজ-ব্যবস্থা উপস্থিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল—সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক ধারায় ইতিহাসের নাকি প্রয়োজন নেই! বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্বন্ধের দ্বৈত প্রকৃতিকে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। যে সম্বন্ধে বিত্ত উৎপাদিত হচ্ছে—তাতেই জন্ম নিচ্ছে বিত্তহীনতার দুঃখ, উৎপাদনশক্তি বেড়ে যাচ্ছে নির্যাতনকে বাড়িয়ে তুলে। শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়ারা বিত্ত-সঞ্চয় করে যাচ্ছেন সমাজে অগণিত বিত্তহীন শ্রমিক তৈরী করে।

এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করবার মতও অর্থনীতিজ্ঞ অবশ্য ছিল। অ্যাডাম্ স্মিথ্ বা রিকার্ডো বুর্জোয়া-বিত্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তার সূত্র বা নিয়মগুলো যে সামন্ততান্ত্রিক বিত্তোৎপাদনের সূত্র বা নিয়ম থেকে উন্নত তা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁরা মনে করতেন যন্ত্রশিল্পের যুগে যে দুঃখ-ব্যথার উৎপত্তি হচ্ছে তা সন্তান জন্মের স্বাভাবিক বেদনার মতই অখণ্ডনীয়।

আরেক শ্রেণীর অর্থনীতিজ্ঞও ছিল যারা মানবধর্মী পর্যায়ের। শ্রমিকের দুরবস্থা উপলব্ধি করে তাঁরা শ্রমিকদের উপদেশ দিতেন—পানদোষ নিবারণ করতে, পরিশ্রমী হতে এবং সন্তান জন্ম পরিমিত করতে। পুঁজিপতিদেরও তাঁরা পরিমিত, ন্যায়সঙ্গত উৎপাদনের

উপদেশ দিয়ে বেড়াতেন। কাজ আর মতবাদ, ভাল দিক আর মন্দ দিক এই দুয়ের দুরপনেয় ব্যবধানের উপর তাঁরা তাঁদের উপদেশাবলী তৈরী করে চলেছিলেন।

আরেক দল এমনি ভ্রান্ত ছিলেন যে তাঁরা চাইতেন যে সবাই বুর্জোয়া হোক। তাঁদের এই উদারনীতি বুর্জোয়া সম্বন্ধের সূত্রগুলো বজায় রেখে তার ভেতরকার বিরোধকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল, যা শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব।

বুর্জোয়া সমাজের বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, আদর্শবাদী, নীতিবাদী সব রকম অর্থনীতিজ্ঞের মতবাদের ভ্রান্তি আবিষ্কার করে কার্ল মার্ক্স শেষে এই সমাজের উৎপাদন রীতির সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। অর্থনীতির 'শাশ্বত নিয়ম' আবিষ্কার করাটা মার্ক্সের উদ্দেশ্য ছিল না। এমন কোনো নিয়মের অস্তিত্বকেই তিনি স্বীকার করতেন না। একেকটা যুগের অর্থনীতি একেকটা বিশেষ ধারায় চলেছে—এবং সেই অর্থনীতির উপরই সে সেযুগের সমাজ রূপ পরিগ্রহ করেছে। অর্থনীতির রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদন-শক্তির রূপান্তর দ্বারা—উৎপাদনশক্তি বলতে মার্ক্স বলেছেন, উৎপাদন-কৌশল ও শ্রমিক। সামাজিক পরিবর্তন পরিমাণগত প্রকৃতি নিয়ে খানিক দূর এগিয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠিত বিত্তের রূপ টলে ওঠে না। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন পরিণত উৎপাদন-শক্তি সেই বিত্তের রূপের মধ্যে আর আবদ্ধ থাকতে পারে না—সমাজে তখন ঝাঁকুনি আসে—তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ধ্রুপদী অর্থনীতিজ্ঞ অ্যাডাম স্মিথ্ বা রিকার্ডো ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উহ্য রেখে তাকে যে শাশ্বত ও স্বাভাবিক বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, মার্ক্স সে-ব্যাখ্যাকে উপরোক্ত ব্যাখ্যায় খণ্ডন করে ধনতন্ত্রে বিরোধাত্মক শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন—এবং নির্দেশ করলেন তার অনিবার্য পতনের কারণ।

বিনিময় যোগ্য দ্রব্যকে নিয়ে সুরু হল মার্ক্সের বিশ্লেষণ। ধনতান্ত্রিক সমাজের সেই মৌলিক জীব-কোষ থেকে বিনিময়ের

ভিত্তিতে যে সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা তিনি নির্ণয় করলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা—কারু জন্যে কারুর ভাবনা নেই, সবাই নিজ নিজ স্বার্থ সন্ধানে ব্যস্ত—তাকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিতেই সুচারু রূপে বোঝা যায়।

শ্রমিক তার শ্রম বিক্রয় করছে, চাষী বাজারে নিয়ে বেচে দিচ্ছে ফসল, মহাজন অথবা ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিচ্ছে, দোকানী নানা জিনিষ সাজিয়ে বসেছে, পুঁজিপতি কারখানা তৈরী করছে, মুনফা প্রত্যাশী শেয়ারের বাজারে কেনা বেচায় মত্ত—প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এই বৈষম্যের ও আপাত অসংযোগের মধ্যেও এমন একটা সম্পূর্ণতার রূপ আছে যা মিলনাত্মক নয় বিরোধপূর্ণ, অথচ তা সমাজকে ধরে রাখে এবং উন্নতির দিকেই চালিয়ে দেয়। যে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অর্থনীতির যন্ত্রটি চালু আছে তা-ই ধনতান্ত্রিকতার নিয়ম। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসারিত ক্ষেত্রে নিয়মও অসংখ্য—যদিও তার মূল এক। মার্ক্স সেই মূলটিকে আবিষ্কার করলেন—তা হচ্ছে শ্রম-মূল্যের নিয়ম। সমাজের ভাঁড়ারে খানিকটা জীবন্ত শ্রমশক্তি থাকে। প্রকৃতির উপর এই শক্তিকে নিয়োগ করে মানুষের প্রয়োজন মত দ্রব্য তৈরী হয়। স্বাধীন উৎপাদকরা সবাই একই রকম দ্রব্য তৈরী করে না—শ্রম-বিভাগের ফলে নানা রকম দ্রব্য তৈরী হয়—বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ তাই। গোড়ায় সোজাসুজি দ্রব্যই বিনিময় হত একটা নির্ণিত পরিমাপ মাফিক। শেষটায় সোনা বা টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় চলতে লাগল। যে গুণে দুটি দ্রব্য পরস্পরের সমান হয় তা মানুষের শ্রম যা তাদের উৎপাদনে ব্যয়িত হয়েছে। মূল্য নিরূপণের ভিত্তিই মানুষের শ্রম। লক্ষ লক্ষ বিচ্ছিন্ন উৎপাদকের মধ্যে শ্রমবিভাগ সমাজকে বহুধা বিভক্ত করে দেয় না এই জন্যে যে 'সমাজের প্রয়োজন মাফিক শ্রম-সময়'* খরচ করে যে দ্রব্য তৈরী হয় বাজারে তাদেরই

---

* 'সমাজের প্রয়োজন মাফিক 'শ্রম-সময়' মানে উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থায় এবং যুগোপযোগী গড় পরিমাণ কৌশলের উপর নির্ভর করে' একটি দ্রব্য তৈরী করতে যে সময় খরচ হয়।

বিনিময় চলে। একটি দ্রব্যের সমাজের প্রয়োজন মাফিক শ্রম থাকা না থাকার উপর বাজারে তার কাটতি আর ঘাটতি নির্ভর করে। এ ব্যাপারের উপর বিনিময়ের পরিমাণটাও তৈরী হয়। শ্রম-মূল্যকে ঘিরে আছে বলেই দ্রব্যের দাম তার যথার্থ মূল্যের কম বা বেশি হতে পারে। এটা অবশ্যি কোনো বিশেষ একটা দ্রব্য সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু সমাজপ্রসূত সমস্ত দ্রব্যের মোট মূল্য তার মোট দামের সমান হতে বাধ্য, কেননা আখেরে দেখা যায় মানুষের শ্রমশক্তি যে মূল্য তৈরী করেছে সমাজের হাতে শুধু তাই আছে—তার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার উপায় দামের নেই।

প্রযুক্ত শ্রমপরিমাণের নিরিখেই যদি দ্রব্যের বিনিময় চলে তবে এই সমতা থেকে অসাম্যের উদ্ভব কি করে হয়? মার্ক্স এ প্রশ্নের মীমাংসা করলেন মূল দ্রব্যের অদ্ভুত প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। সব দ্রব্যের ভিত্তিতে আছে সে মূল দ্রব্য—তার নাম শ্রমশক্তি। উৎপাদনোপায় যার হাতে সেই পুঁজিপতি এই শ্রমশক্তি ক্রয় করে। বেঁচে বর্তে থাকতে শ্রমিকের যতটুকু প্রয়োজন তা-ই তার শ্রমশক্তির মূল্য বলে ধার্য করা হয়। শ্রমিককে কর্মে নিয়োগ করা মানে নূতন মূল্য উৎপাদন করা। এই মূল্যের পরিমাণ শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদনের মূল্যের চেয়ে বেশি দাঁড়ায়। শ্রমিককে শোষণ করবে বলেই পুঁজিপতি তার শ্রম কিনে নেয়। এই শোষণই অসাম্যের জন্ম দেয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের যতটুকু মূল্য শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদন বহন করে মার্ক্স তাকে বলেছেন প্রয়োজনীয় উৎপাদন। তার বাইরে শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার নাম দিয়েছেন উদ্বৃত্ত উৎপাদন। ক্রীতদাসরা প্রভুর জন্য, ভূমিদাসরা জমিদারের জন্য এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে গেছে এবং বেতনভুক শ্রমিকরা তা-ই অধিক পরিমাণে করে যাচ্ছে পুঁজিপতির জন্য—তা নইলে পুঁজিপতির শ্রমশক্তি কিনবার দরকারই ছিল না। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ভোগ দখলকার যে, সে-ই ধনসঞ্চয় করে, সে-ই হয় সমাজপ্রধান, রাষ্ট্রের কর্ণধার। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মূল্যকেই উদ্বৃত্ত

মূল্য বলা হয়। 'সম্পদ হচ্ছে চুরির মাল—' প্রুধোঁর এই উক্তির যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মার্ক্স‌ই করলেন, অর্থনীতির ভিত্তির এমনই একটি অভ্রান্ত সূত্র আবিষ্কার করলেন যা অখণ্ডনীয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কোনো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের সমতুল্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই 'সারপ্লাস্ ভেল্যু' বা উদ্বৃত্ত মূল্যের রহস্যোদ্ঘাটন।

পুঁজি মুনফা আনে—সঞ্চয়ের পথ দেখিয়ে দেয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশকে পুঁজি হিসেবে খাটাতে থাকে পুঁজিপতি। চক্রবৃদ্ধি সুদের মত উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজি তৈরী করে চলে। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্য যে বিরাট পুঁজি তৈরী করে তার পরিমাণের তুলনায় মূল পুঁজি অদৃশ্য মতই মনে হয়।

মানুষের নিজের শ্রমের উপর আগেব দিন তার সম্পদ নির্ভর করত। উৎপাদকেরা নিজেরাই দ্রব্য বিনিময় করে নিজের শ্রমশক্তি অনুযায়ী সম্পদ অর্জন করতে পারত। এখন উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শ্রমিকের ত কোনো দাবী নেই-ই উপরন্তু বিনাপয়সায় তাকে খানিকটা শ্রম খরচ করে দিয়ে আসতে হয়, সেই উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য লাভ করে পুঁজিপতি। সেই মূল্য খানিকটা পুঁজিপতির মুনফার ঘরে জমা হয়ে আত্ম প্রয়োজনে খরচ হয়, খানিকটা পুঁজির ঘরে সঞ্চিত হয়ে স্ফীতকায় হতে থাকে। পুঁজিপতি মূর্তিমান পুঁজি—তাছাড়া তার আর কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা নেই। কৃপণের মত সঞ্চয়ের খাতিরেই সঞ্চয় করবার লোভ তার, সম্পদকে সম্পদ-সংগ্রাহক করে তুলতে পারলেই সে সুখী। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য—উৎপাদনের খাতিরেই উৎপাদন করবার জন্য সহস্র সহস্র মানুষকে সে খাটিয়ে যায়। তা' ক'রে অবশ্যি সে সমাজের উৎপাদন-শক্তিকেও বাড়িয়ে তোলে আর তৈরী করে এমন একটি অবস্থা যা উন্নততর সমাজের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।